বিজ্ঞাপন।

প্রবন্ধমালা বিদ্যালয়-সমূহের পাঠ্য হওয়াতে ইহা দ্বিতীয় বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। এবার ইহার অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; ভাষা পূর্ব্বাপেক্ষা সহজ-বোধ্য করা গিয়াছে, এবং আবশ্যক বোধে কয়েকটী অবশ্যজ্ঞাতব্য নুতন বিষয় ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে।

বিদেশীয় লোকের জীবন-চরিত অথবা বৈদেশিক বিবরণ পাঠ অপেক্ষা স্বদেশীয় মহৎ ব্যক্তির জীবন-বৃত্ত ও স্বদেশের বিবরণ-পাঠে বালকদিগের অনেক উপকার হইয়া থাকে। বাল্যকাল হইতেই বৈদেশিক লোকের বিবরণ পাঠ করিলে স্বদেশের প্রতি মমতা বা আস্থা কিছুই থাকে না; সুতরাং শিক্ষা উদাসীন হয়, মানসিক ভাব বৈদেশিক হয়, এবং স্বজাতি-স্নেহ বিলুপ্ত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান গ্রন্থে ভারতবর্ষের কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে নীতিজ্ঞানের সহিত বালকদিগের স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রিয়তা জন্মিতে পারে।

অবিচ্ছেদে এক বিষয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় পাঠক ও শিক্ষক উভয়েরই বিরক্তি জন্মিয়া থাকে। এজন্য উপস্থিত পুস্তকে, ইতিহাস, জীবন-বৃত্ত, বিজ্ঞান, স্থানীয় বিবরণ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় ও চিত্তামোদকর নানাবিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রবন্ধমালার "শিষ্টাচার" ও "শাস্ত্রালোচনা"-শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয় বেকনের সন্দর্ভ হইতে এবং "ভারতমহিলার দয়া ও প্রভুভক্তি"-শীর্ষক প্রবন্ধ শ্রীযুত নাইটন সাহেবের লিখিত "হিন্দু ললনা" নামক সন্দর্ভ হইতে পরি-গৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহার ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক বিবরণ প্রভৃতি টড্, মাল্কম, কানিংহাম্, ম্যাক্গ্রেগার, প্রকটর প্রভৃতির গ্রন্থ ও তত্ত্ব-বোধিনী, রহস্যসন্দর্ভ প্রভৃতি সাময়িক পত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ইতি।

হিন্দুহোষ্টেল,
কলিকাতা।
১৫ই পৌষ, ১২৮৫।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

সূচী।

প্রবন্ধ-মালা।

অন্ধদিগের শিক্ষা ও জীবনোপায়।

যাহারা দুই চক্ষে কিছুই দেখিতে পায় না, তাহাদিগকে অন্ধ কহে। অন্ধত্ব কি মর্ম্মান্তিক ক্লেশের আকর! কি দুরপনেয় যন্ত্রণার নিদান। অন্ধগণ জগতের সমুদায়ই গাঢ় অন্ধকারময় দেখে। পৃথিবী যেন তমসময়ী হইয়া তাহাদিগের নিকট অবস্থিতি করে। চক্ষুহীনগণ সর্ব্বদাই পর-প্রত্যাশী হইয়া থাকে। স্থানান্তরে গমনাগমন প্রভৃতি অনেক কার্য্যেই তাহাদিকে অপরের সাহায্য লইতে হয়, অন্যথা তাহাদিগের যার পর নাই ক্লেশ হইয়া থাকে।

অন্ধদিগের সহানুভূতি প্রবল নহে। স্বয়ং না দেখিলে অপরের শারীরিক চেষ্টাগত ভাব কখনই সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয় না। যদি কেহ দুঃসহ যন্ত্রণা পায়, অথবা অনুপম আনন্দ লাভ করে, তাহা হইলে সে প্রায়ই দেহের কোন বিশেষ ভঙ্গী দ্বারা আপনার যাতনা বা আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া থাকে, এই যাতনা বা আহ্লাদ বুঝিতে হইলে স্বচক্ষে দেহের ভঙ্গিবিশেষ দেখা আবশ্যক। কিন্তু অন্ধগণ দর্শন বিষয়ে একান্ত বঞ্চিত। সুতরাং তাহাদিগের সহানুভূতি যে হীনতর হইবে, সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। অন্ধগণ এই অনুভূতির অভাব বশতঃ ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিয়া থাকে। সুপ্রসিদ্ধ সার আইজাক নিউটনের সমকালে সণ্ডার্সন নামক একজন গণিতবেত্তা অন্ধ ছিলেন।

ইতিনিও সম্যক্‌জ্ঞানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বুঝিতে পারেন নাই। উঁহার অন্তিম সময়ে একজন ধর্ম্মোপদেষ্টা ঐশ্বরিক তত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা পাওয়াতে সণ্ডার্সন কহিয়াছিলেন, "আমি সমস্ত জীবন কেবল অন্ধকার মধ্যেই অতিবাহিত করিলাম। প্রকৃতির কৌশল আমার নিকট অলীক বোধ হইল। আপনি যে সমস্ত ঐশ্বরিক তত্ত্ব ব্যক্ত করিতেছেন, তাহা কেবল আপনি ও আপনার ন্যায় ব্যক্তিগণই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।"

গণিতবেত্তার এই নাস্তিকতা-প্রকাশক কথা শুনিয়া উল্লিখিত ধর্ম্মোপদেষ্টা নিউটন প্রভৃতির ধর্ম্মভাব ব্যক্ত করিলে সণ্ডার্সন উত্তর করিলেনঃ— "নিউটন প্রকৃতির বিচিত্র কৌশলময় কার্য্য দেখিয়া ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করিয়াছেন, কিন্তু আমার পক্ষে তাহা প্রবল নহে। যাহা হউক, এক্ষণে নিউটনের বিশ্বাসা 'পরমেশ্বর' শব্দটীতে বিশ্বাস করিতে হইল।" পরিশেষে এই গণিতবেত্তা "হে নিউটনের ঈশ্বর! অন্তিম সময়ে আমাকে তোমার করুণার আস্পদ কর" বলিয়া পরলোকগত হইয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, জন্মান্ধগণ এক প্রকার নাস্তিকের ন্যায় কালাতিপাত করে। কেবল ইহাই তাহাদিগের শোচনীয় দশার শেষ সীমা নহে; দর্শন-শক্তির অভাবে অসহনীয় যাতনায় পীড়িত হইয়া ইহারা সর্ব্বদা সকরুণ বিলাপে সাধারণের হৃদয় ব্যথিত করিয়া থাকে। কবি-শ্রেষ্ঠ মিল্টন স্বপ্রণীত "স্বর্গভ্রষ্ট" নামক মহাকাব্যে স্বীয় দুঃসহ অন্ধত্ব লক্ষ্য করিয়া এই ভাবে আক্ষেপোক্তি করিয়াছেন, "বৎসরের সহিত ঋতু সকল প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে, প্রকৃতি প্রতি ঋতুতে নব নব ভূষায় ভূষিত হইয়া জনগণের নিকট উপস্থিত হইতেছে; কিন্তু হায়! আমার নিকট কিছুই ফিরিয়া আসিতেছে না। মনোহর প্রাভাতিক লক্ষ্মী, নয়নরঞ্জন সায়ন্তন শ্রী, সুশোভন বাসন্ত দৃশ্য, সুরম্য পুষ্পশ্রেণী এবং সৌন্দর্য্যময় মানব-বদন প্রভৃতি কিছুই

প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে না। এই সকলের [illegible] কেবল ঘোর অন্ধকার আমাকে পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে। আমি মানব-গণের প্রীতিপ্রদ কার্য্যক্ষেত্র হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছি। আমার নিকট প্রকৃতির জ্ঞান-গর্ভ পুস্তক শূন্যময় হইয়া অবস্থান করিতেছে এবং দর্শন-জ্ঞানের পথ নিরন্তর অবরুদ্ধ রহিয়াছে।”

ফলতঃ অন্ধগণ বহুবিধ কষ্ট ও অশান্তি অনুভব করিয়া থাকে। স্বাধীন ভাবে জীবিকা সংস্থান করা এই দুর্ভাগাদিগের নিতান্ত ক্লেশসাধ্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু স্থিরচিত্তে উপায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে উহা তাদৃশ কষ্টকর বোধ হইবে না।

অন্ধত্ব যেমন কতিপয় ক্লেশ-সমষ্টির নিদান, তেমনি কয়েকটী সদ্‌গুণ-সমষ্টিরও আকর। অন্ধাবস্থায় স্মৃতিশক্তি তীব্র হয়, মনোযোগ অধিক হয় এবং কল্পনা ও চিন্তা-শক্তি সতেজ হইয়া থাকে। অধিকন্তু বাহ্য জগৎ অন্ধদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে না পারাতে অন্তঃকরণ স্থির হয়। মালব্রাঙ্গ নামে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি কোন বিষয়ে গাঢ়রূপে মনোযোগ দিবার সময়ে সূর্য্যালোক প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত গৃহের গবাক্ষ সকল রুদ্ধ করিতেন, ইহাতে অবস্থান-গৃহ অন্ধকারময় হইয়া তাঁহার চিন্তাশক্তির পক্ষে বিশিষ্ট অনুকূল হইত। দৃষ্টিশক্তি না থাকাতে অন্ধগণ কোন লিখিত বিষয় স্বয়ং পাঠ করিয়া তাহার মর্ম্ম অবগত হইতে পারে না, সুতরাং তাহারা অবিচ্ছিন্ন মনোযোগের সহিত অপরের পাঠ শ্রবণ করে এবং পাঠ সমাপ্ত হইলেও শ্রুত বিষয়গুলি পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া মনে রাখিতে সবিশেষ প্রয়াসবান্ হয়। এই রূপে স্মৃতি, মনোযোগ ও চিন্তা তিনটীই সমভাবে চালিত হওয়াতে সকল গুলিই সতেজ হইয়া উঠে। কথিত আছে, ডিমক্রিতস্ নামক এক জন বিজ্ঞানবেত্তা এই সমস্ত গুণ বর্দ্ধিত

করিবার নিমিত্ত আপনার দুই চক্ষু উৎপাটিত করিয়াছিলেন। চিন্তা-শক্তির প্রগাঢ়তা প্রযুক্ত অন্ধদিগের কবিত্ব ও গণিতশাস্ত্রে সবিশেষ পারদর্শিতা জন্মিয়া থাকে। ইংলণ্ডের মহাকবি মিল্‌টন্ অন্ধত্ব অবস্থায় 'স্বর্গভ্রষ্ট' নামক অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য প্রণয়ন করিয়া কবিত্বশক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। বর্ণিত আছে, গ্রীস্ দেশীয় মহাকবি হোমর অন্ধ ছিলেন, কিন্তু তিনিও বীররসাত্মক 'ইলিয়াদ' কাব্য রচনা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। সণ্ডার্সনের বিষয় একবার লিখিত হইয়াছে, তিনি যে কেবল দৃষ্টিশক্তি-হীন ছিলেন এমন নহে, তাঁহার দর্শনেন্দ্রিয় মাত্রও ছিল না। কিন্তু শেষে এই অন্ধ মহাত্মা স্বাবলম্বন-বলে বিজ্ঞান ও গণিত বিদ্যায় বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করেন। অধিক কি এই মহাত্মাই কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে জগদ্বিখ্যাত সর আইজাক্ নিউটনের আসন গ্রহণ করিয়া ছাত্রদিগকে যথারীতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। এজন্য সণ্ডার্সনকে জীবিকা-নির্ব্বাহ সম্বন্ধে কোন প্রকার কষ্ট স্বীকার করিতে হয় নাই। ইনি অধ্যাপনা কার্য্যে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া পোষ্যবর্গেরও ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। আমেরিকা-বাসী বিখ্যাত গ্রন্থকার প্রেস্‌কটের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। ইনিও সংসারে প্রবেশ করিয়া একরূপ অন্ধত্বাবস্থায় কালযাপন করেন। বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন সময়ে প্রেস্‌কটের এক চক্ষু নষ্ট হয়, পরিশেষে ঘটনা বশতঃ অন্য চক্ষুটীরও দুই বার দর্শন-শক্তি বিলুপ্ত হয়। প্রেস্‌কট এইরূপ বিপন্ন অবস্থাতেও কতিপয় ইতিবৃত্ত-মূলক প্রবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইনি অন্ধনিবাস বিষয়ে একটী মনোহর প্রবন্ধ লিখিয়া অন্ধত্বকে বধিরতা অপেক্ষা সৌভাগ্যজনক বলিয়াছেন। ইউলার অন্ধ ছিলেন, কিন্তু তিনিও বিখ্যাত গণিত ও বিজ্ঞান-বেত্তা বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন।

অন্ধদিগের শিক্ষা ও জীবনোপায়।

অন্ধদিগের যেমন মনঃসংযোগ প্রভৃতি গুণ সতেজ হয়, তেমনি স্পর্শজ্ঞান অসাধারণ তীব্র হইয়া থাকে। অনেক অন্ধ কেবল হাত বুলাইয়া পদার্থ সকলের বর্ণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়। কেবল ইহাই নয়; ইহাদের অনেকে প্রকৃত চক্ষুষ্মানের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। এমনও অবগত হওয়া গিয়াছে যে, ইহারা ঘোর অন্ধকারময় রজনীতে পথ-প্রদর্শকের কার্য্য করিয়া পথিকদিগকে গন্তব্য স্থানে রাখিয়া আসিয়াছে। ডাক্তার বিউ উল্লেখ করিয়াছেন, ডার্বিশায়ারে তাঁহার পরিচিত একটী অন্ধ রাত্রিকালে তুষারময় বক্র পথ দিয়া পথিকদিগকে লইয়া যাইতেন, পরিশেষে ইনি পথের জরিপী কার্য্যে নিয়োজিত হয়েন। প্রসিদ্ধ স্থপতি ম্যাকুডক অন্ধ ছিলেন। তিনিও এইরূপ পথ-প্রদর্শকের কার্য্য করিয়া পথিকদিগকে চমৎকৃত করিয়া গিয়াছেন। অধিকন্তু ইনি স্থপতি-বিদ্যাতেও জনসমাজে খ্যাতি লাভ করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

এক ইন্দ্রিয়-শক্তি হীন হইলে অপর শক্তিগুলি সহজেই সতেজ ও স্বকর্ম্মপ্রবণ হইয়া উঠে। সুতরাং অন্ধদিগের অন্যান্য জ্ঞানশক্তি গুলি যে অপেক্ষাকৃত প্রবল ও তেজস্কর হইবে, সহজেই বুঝা যাইতে পারে। অন্ধদিগের ইন্দ্রিয়-বিশেষের শক্তির বিষয় শ্রবণ করিলে অবাক্ ও হতবুদ্ধি হইতে হয়। অন্ধ বিজ্ঞানবেত্তা ডাক্তর ময়সি কোন বন্ধুর পরিহিত পরিচ্ছদের বর্ণ কেবল আঘ্রাণ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। উত্তর আমেরিকার অন্তর্ব্বর্ত্তী ইউনাইটেডষ্টেটস্-নিবাসী অধ্যাপক আপহাম উল্লেখ করিয়াছেন, হার্টফোর্ডের অন্ধনিবাস-বাসিনী একটী বালিকা কেবল হস্তপরামর্শ দ্বারা রজকীর বস্ত্রের বস্তা হইতে নিজের বস্ত্রগুলি চিনিয়া লইত। ডাক্তর রাস্ লিখিয়াছেন, ফিলাডেলফিয়া নগরের দুইটী অন্ধ ভ্রাতা বেড়াইবার সময় অগ্রপথে শঙ্কু

ইত্যাদি প্রেরিত থাকিলে তাহা জানিতে পারিত। এই আতুরের অপূর্ব্ব সংস্কার-বলে মস্তকোপরি উড্ডীয়মান ক্রীড়া-কপোতের সংখ্যাও নির্দ্দেশ করিয়া দিত। সুবিখ্যাত বিজ্ঞান ও গণিত-বেত্তা সণ্ডার্সন অসাধারণ স্পর্শশক্তিবলে পুরাতন এবং অনুকৃত নূতন পদক সমূহ ভাগ করিয়া দিতে পারিতেন। এই শক্তি-সম্পন্ন অন্ধ মহাপুরুষ যখন উদ্যানে বসিয়া জ্যোতিষ বিদ্যার আলোচনা করিতেন, তখন আকাশ পথে যে সমস্ত মেঘখণ্ড চলিয়া যাইত, তৎসমুদয় নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া দিতেন।

কেবল ভিন্ন দেশের মুখাপেক্ষা না করিলেও আমাদের দেশ হইতে অন্ধদিগের ঈদৃশ অসাধারণ শক্তি বিশেষের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যাইতে পারে। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ী সুরদাস অন্ধ ছিলেন। তিনিও এই অন্ধত্ব অবস্থায় দশ সহস্র পদাবলি রচনা করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়েও ঈদৃশ ব্যক্তি দুষ্প্রাপ্য নহেন। নদীয়া জেলার রাণাঘাটের নিকটবর্ত্তী আনুলিয়া গ্রামবাসী দীননাথ নামক জনৈক ব্যক্তি চারি মাস বয়ঃক্রম কালে হাম রোগে অন্ধ হয়েন। পঠদ্দশায় ইনি ১২৭২ কি ৭৩ সালে কাশীতে গমন করেন। সেই স্থানে সর্ব্বদা গুরুর নিকটে বসিয়া থাকাতে ৬ খানি উপনিষদ্ অন্বয় ও ব্যাখ্যাসহ মুখস্থ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইঁহার কবিত্ব ও সঙ্গীতেও বিলক্ষণ পারদর্শিতা আছে। স্বয়ং নানাবিষয়ে গীত রচনা করিয়া তানলয়-বিশুদ্ধ স্বরে গান করিতে পারেন। এই স্থলে দীননাথের বিরচিত একটী গানের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল:—

"আমি এসেছি যারো আদেশে,
যাব কোথা তার উদ্দেশে।
নিজ স্নেহগুণে বাঁধি জীবগণে,
কে পালে যতনে, আছে জগত
মোহিত, কার প্রেমাভাবে।"

অন্ধদিগের শিক্ষা ও জীবিকোপায়।

সংবাদপত্রপাঠে অবগত হওয়া গিয়াছে, নদীয়া জেলার একজন অন্ধ অধ্যাপক, অসাধারণ মেধা ও মনোযোগ-বলে সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন হইয়া, স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবসায় করিয়া, ছাত্রদিগকে নিয়মিতরূপে শিক্ষা দিয়াছেন। এই জেলার অন্য একজন অন্ধ বৈদ্য ঔষধের বাক্স হইতে পীড়িতদিগকে যথাযোগ্য ঔষধ দিতেন। ইহাঁর স্পর্শ-জ্ঞান এমন তীক্ষ্ণ ছিল যে, ইনি নাড়ী দেখিয়া লোক চিনিতে পারিতেন। এবিষয়ে একটি কৌতুকাবহ গল্প আছে। একদা কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইহাঁর স্পর্শশক্তি পরীক্ষা করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া জনৈক ভৃত্যকে নিজের সুসজ্জিত ও সুপরিষ্কৃত শয্যায় শায়িত করেন, এবং তাহার আপাদমস্তক বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া চিকিৎসককে ডাকিয়া পাঠান; চিকিৎসক গৃহ-স্বামীর পীড়া হইয়াছে শুনিয়া, এই শয্যাশায়িত ভৃত্যের নিকট উপস্থিত হয়েন, ভৃত্য নাড়ী দেখাইতে হস্ত প্রসারণ করে, চিকিৎসক নাড়ী স্পর্শ করিয়াই বলিয়া উঠেন, "ইহা গৃহ-স্বামীর হাত নহে, কোন গণ্ডমূর্খ চাকরের হাত।" এই অন্ধ চিকিৎসকের নাম কালিদাস গুপ্ত। ইনি চিকিৎসা ব্যবসায়ে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী জয়নগর গ্রামে এক জন অন্ধ আছেন। ইহাঁর নাম অঘোর নাথ মুখোপাধ্যায়। ইনি সূতিকা-গৃহে অন্ধ হয়েন। অঘোর নাথ অন্ধ হইয়াও অধ্যবসায়ের সহিত ইংরেজী ও বাঙ্গালা শিখিয়া কয়েক খানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। সংবাদপত্র পাঠে জানা যায়, সম্প্রতি ইউরোপ ভূখণ্ডে একখানি সংবাদপত্র প্রচারিত হইতেছে। ইহার সম্পাদক, লেখক ও বর্ণ-সংযোজক (কম্পোজিটর) সকলেই অন্ধ।

উল্লিখিত উদাহরণ সকল দ্বারা অন্ধদিগের ক্ষমতা অনেক অংশে বুঝা যাইবে, এবং তাহারা মনোযোগ করিলেই যে স্বাধীন

ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী অংস্থান করিতে পারে, তাহা অনুমিত হইবে। কিন্তু পূর্ব্বে যে কতিপয় যশস্বী ব্যক্তির নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসদৃশ ব্যক্তি হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা বহুকাল-সাপেক্ষ। বিশেষতঃ অন্ধগণ যে কেবল অধ্যাপনা করিয়াই জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে এমন আশা করাও অসঙ্গত। অন্ধদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের সংস্থান করিয়া দিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটী উপায় অবলম্বন করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য ;—

১ম। অন্ধনিবাস স্থাপন।

২য়। উক্ত নিবাসে অন্ধদিগের শিক্ষানুকূল নিয়ম প্রচলন ও অন্ধদিগকে যথারীতি শিক্ষা প্রদান।

৩য়। নিবাসস্থ অন্ধদিগের শিল্পজাত দ্রব্যসমূহ বিক্রয় করিয়া তদুৎপন্ন অর্থ দ্বারা নিবাস রক্ষার মূলধন বৃদ্ধি করণ।

৪র্থ। শিক্ষার পরিচয় গ্রহণ ও পুরস্কার স্বরূপ উপযুক্ত অন্ধদিগের সংসারে প্রবেশ করিবার উপায় স্থাপন।

৫ম। স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য সুশিক্ষিত অন্ধদিগকর্ত্তৃক নিবাস-শিক্ষিত বিষয় অনুসারে যথারীতি ব্যবসায় অবলম্বন।

অন্ধনিবাস স্থাপন ও তথায় যথারীতি শিক্ষা প্রদান প্রভৃতি কতিপয় বিষয়ের সহিত অন্ধদিগের জীবিকা সংস্থানের সম্বন্ধ আছে। অতএব অগ্রে অন্ধনিবাসের বিষয় বিবৃত করিয়া পশ্চাৎ অন্ধদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের বিষয় লেখা যাইতেছে।

১ম। অন্ধনিবাস স্থাপন।

জীবিকা-সংস্থানের অনুরূপ শিক্ষা লাভ করা নিজের আয়ত্ত নহে। এ বিষয়ে অপরের সাহায্য লইতে হয়। যাঁহারা স্বশক্তি-সমুত্থিত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও কোন না কোন বিষয়ে অপরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। যখন চক্ষুষ্মান-

ও অপরের সাহায্য গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছেন, তখন অন্ধগণ যে কেবল নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিবে, তাহা সম্ভাবিত নহে। অন্ধদিগের জীবিকা-সংস্থান করা হিতৈষিগণের অভীষ্ট হইলে শিক্ষনীয় অবস্থা হইতেই তাহাদিগের তত্ত্বাবধারণের ভার নিজহস্তে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্য অনুসারে কার্য্য করিতে হইলে স্থানবিশেষে এক একটী অন্ধনিবাস স্থাপন করা একান্ত বিধেয়। অন্ধনিবাস যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলে, অন্ধদিগের অবস্থান ও আহারাদি বিষয়ের তত্ত্বাবধারণার্থ এক একজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। এই অধ্যক্ষ যথানিয়মে সমুদয় অন্ধের অবস্থান প্রভৃতির সুবিধা করিয়া দিবেন। ফলে অন্ধদিগের অবস্থানাদি সম্বন্ধে যাহা কিছু আবশ্যক, তৎসমুদয়ের সম্পাদন বিষয়েই ইঁহাকে দায়ী হইতে হইবে।

অন্ধনিবাস স্থাপন করিবার পূর্ব্বে মূলধন স্থাপন করা বিধেয়। এই মূলধন-সঞ্চিত অর্থ দ্বারাই নিবাসের আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে। মূলধন-রক্ষার ভার নিবাস সম্পর্কীয় কতিপয় হিতৈষী ব্যক্তির হস্তে রাখা উচিত। উক্ত মহোদয়গণ সাক্ষাৎসম্বন্ধে নিবাস রক্ষণোপযোগী মূলধন রক্ষিকরণ ও তদুৎপন্ন অর্থদ্বারা নিবাসের আবশ্যক ব্যয় সম্পাদন, স্বকর্ত্তব্যের মধ্যে গণনা করিবেন।

এডেনবরা ও পারীনগরীতে এক একটী অন্ধনিবাস স্থাপিত হইয়াছে। ইহার পরে আমেরিকার নিউইয়র্ক নগরেও আর একটী অন্ধনিবাস স্থাপিত হয়। শেষোক্ত নিবাসটী ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে জন্ ফিসার কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়া অনেক সুফল প্রসব করিতেছে। অস্মদ্দেশেও এইরূপ এক এক একটী অন্ধ-নিবাস স্থাপিত হইলে উপকার হইতে পারে। এ বিষয়ে গবর্ণ-

[illegible] মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা বিধেয় নহে। স্বদেশ-হিতৈষি-গণের স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হওয়া উচিত।

১৪। অন্ধনিবাসে অন্ধদিগের শিক্ষানুকূল নিয়ম স্থাপন ও অন্ধদিগকে যথারীতি শিক্ষা প্রদান।

অন্ধনিবাস স্থাপন ও নিবাসবাসী অন্ধদিগের অবস্থানের সুবিধা করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। যাহাতে অন্ধদিগের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইতে পারে, তাহার উপায় বিধান করাও একান্ত কর্ত্তব্য। অন্ধদিগকে যথা নিয়মে শিক্ষা দিয়া সংসারের উপযুক্ত করিলেই তাহাদিগের উন্নতিপথ প্রশস্ত হইয়া উঠিবে। নিম্নলিখিত বিষয় গুলি অন্ধনিবাসে শিক্ষা দিলে অপেক্ষাকৃত সুফল পাওয়া যাইতে পারে:—

সঙ্গীত বিদ্যা, সূচিকার্য্য, রজ্জু ও ব্যবহার্য্য (চাঙ্গারি ইত্যাদি) প্রভৃতির নির্ম্মাণ, লিখন ও পঠন।

উক্ত বিষয় গুলি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত সময় ভাগ করিয়া দেওয়া উচিত। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের কতিপয় শিক্ষক যথাসময়ে অন্ধদিগকে নির্দ্দিষ্ট বিষয় গুলি শিক্ষা দিবেন। এইরূপ শিক্ষা দিতে হইলে কতিপয় নিয়ম করা আবশ্যক হইবে। [illegible]-ষিত বিষয়ে নিম্ন লিখিত কয়েকটী নিয়ম প্রচলিত করা উচিত।

নিবাসের নিকটে কি নিবাস-মধ্যে একটী সুপ্রশস্ত গৃহে অন্ধ-শিক্ষালয় স্থাপন করা উচিত। প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্ন ১০টা হইতে পরাহ্ন ৬টা পর্য্যন্ত অন্ধদিগকে যথানিয়মে পূর্ব্বোক্ত বিষয় গুলি শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

অন্ধদিগকে [illegible]ের মধ্যে এক দিন বিশ্রাম দিয়া চিত্তবিনো-দনার্থ অবকাশ-কাল নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে যাপন করিতে দেওয়া উচিত। সঙ্গীতের অনুশীলন, সকলে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া বিশুদ্ধ উপন্যাস কি অন্যবিধ কোন ইতিহাস শ্রবণ

এবং অন্ধদিগের উপযুক্ত পদ্ধতি অনুসারে বিবিধ মুদ্রিত পুস্তক অধ্যয়নই এই চিত্তবিনোদনের প্রশস্ত উপায়। শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষার্থ ব্যায়ামাদি করিতে দেওয়াও উচিত। শিক্ষনীয় বিষয় অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ভাগ করিয়া যথাসময়ে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। অন্ধদিগের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি পূর্ব্ব-প্রদর্শিত বিষয় গুলির যে কোন বিষয় শিক্ষা করিতে অভিলাষ করে, তাহাকে সেই সেই বিষয়ের শিক্ষাধীন করা কর্ত্তব্য। অথবা যে ব্যক্তি যে বিষয় গুলিতে অল্প সময়ের মধ্যে সুশিক্ষিত হইতে পারে, তাহাকে সেই বিষয় শিক্ষা দেওয়া উচিত। অপেক্ষাকৃত উন্নত ক্ষমতাশালী অন্ধদিগকে একবারে তিন চারিটী বিষয়ের শিক্ষাধীন করাও অবিবেচনা-সিদ্ধ নহে।

অন্ধ-নিবাসে শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে পাঠোপযোগী পুস্তক সমূহ অন্ধদিগের অবস্থা-সঙ্গত করিয়া মুদ্রিত করা আবশ্যক। এ বিষয়ে সবিশেষ কৌশল দেখাইতে হইবে। কাষ্ঠফলকে অক্ষর সমূহ খুদিয়া অন্ধদিগকে বর্ণপরিচয় শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাদিগের অধ্যয়নের পুস্তক সকল মুদ্রিত না করিলে বর্ণ-শিক্ষা নিতান্ত বিফল হইয়া উঠিবে। এই রূপ পুস্তক মুদ্রিত করিতে হইলে অনুকৃতি দর্শন অপেক্ষা কল্পনা ও চিন্তাশক্তি পরিচালনের সমধিক প্রয়োজন। নিম্ন লিখিত তিন প্রকার প্রণালী অনুসারে অন্ধদিগের পাঠোপযোগী পুস্তক সমূহ মুদ্রিত করা যাইতে পারে :—

১। বর্ত্তমান সংক্ষিপ্ত লিখন-প্রণালীর ন্যায় কোন মুদ্রণ-পদ্ধতি বিশেষ অবলম্বন।

এই প্রণালী অনুসারে অন্ধদিগের পাঠোপযোগী পুস্তক মুদ্রিত করিতে হইলে বিশিষ্ট কৌশলের সহিত এক একটী পদ-প্রকাশক এক একটী অক্ষর প্রস্তুত করা আবশ্যক। প্রস্তুত অক্ষর

গুলি এমন ভাবে নির্ম্মাণ করা উচিত যে, সেই অক্ষরে কাগজের এক পৃষ্ঠা সবলে মুদ্রিত করিলে অপর পৃষ্ঠা-স্ফুটিত অক্ষর গুলি বিপর্য্যস্ত না হইয়া স্বাভাবিক অবস্থাপন্ন হয়। এই অক্ষর সমূহে মোটা কাগজের এক পৃষ্ঠা বিনা কালীতে এরূপ ভাবে মুদ্রিত করা আবশ্যক যে, অপর পৃষ্ঠায় সেই অক্ষর গুলি পরিস্ফুট হইয়া হস্ত-পরামর্শ-বোধ্য হইতে পারে। অন্ধদিগের সম্বন্ধে এই প্রণালীটিই উৎকৃষ্ট বোধ হয়। এরূপ করিলে অন্ধদিগকে সর্ব্বদা আকার ইকার, বিন্দু, বিসর্গ প্রভৃতির অন্বেষণ-জনিত কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না। তাহারা কেবল হাত বুলাইয়া প্রয়োজনীয় পুস্তকের মর্ম্ম অবগত হইয়া অনির্ব্বচনীয় প্রীতি লাভ করিতে পারিবে।

২। প্রথমোক্ত প্রণালী অনুসারে প্রচলিত অক্ষর সমূহে মোটা কাগজের এক পৃষ্ঠা মুদ্রিত করা।

প্রথম পদ্ধতি অনুসারে প্রচলিত বড় বড় অক্ষরে মোটা কাগজের এক পৃষ্ঠা মুদ্রিত করিলেও কায চলিতে পারে। অন্ধগণ ইহাও পূর্ব্বের ন্যায় হস্ত-পরামর্শ দ্বারা বুঝিয়া লইতে পারিবে।

৩। গাঢ় মসী দ্বারা বড় বড় অক্ষরে মোটা কাগজের এক পৃষ্ঠা মুদ্রিত করা।

এই পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য করিতে হইলে প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা মুদ্রামসী এমন গাঢ় করিতে হইবে যে, স্ফুটিত অক্ষর গুলি স্বাভাবিক অবস্থা হইতে কিছু উন্নত হয়, এবং অন্ধগণ হাত বুলাইয়া তৎসমুদয় বুঝিতে পারে। এই প্রণালী দ্বারাও অনল্প উপকারের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। প্রস্তাবের প্রারম্ভে অন্ধগণের স্পর্শ শক্তির যেমন উৎকর্ষের বিষয় বিবৃত হইয়াছে, তাহাতেই ইহার আবশ্যকতা বুঝা যাইবে।

ইউরোপের অন্ধনিবাসে উল্লিখিত উপায় তিনটীর অন্যতম পদ্ধতি দ্বারা ব্যাকরণ, ধর্ম্ম বিষয়ক প্রবন্ধ, ইতিহাস, গণিত প্রভৃতি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া অন্ধদিগের বিশিষ্ট উপকার সাধন করিতেছে। শেষোক্ত প্রণালীদ্বয়-অনুসারে মুদ্রিত পুস্তক গুলি খণ্ডশঃ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য. অন্যথা পুস্তকের পত্র সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়িবে। ইউরোপের কোন অন্ধনিবাসে বাইবলের একটী অধ্যায় উক্ত নিয়মানুসারে মুদ্রিত হইয়া তিন খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারের মুদ্রিত পুস্তক সমূহ আশানুরূপ কাজ দিতে পারিবে না, এমন মনে করা নিতান্ত অযৌক্তিক। অন্ধদিগের স্পর্শ জ্ঞানের প্রখরতা যাঁহারা ধারণা করিতে না পারেন, তাঁহারাই এই রূপ অসঙ্গত মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার প্রেসকট লিখিয়াছেন, তাঁহার একজন পরিচিত অন্ধ সঙ্গীত শাস্ত্রের স্বরলিপির কোন্ স্থানে অধিক কালী এবং কোন্ স্থান অল্প কালী দ্বারা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা কেবল হস্ত পরামর্শ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারিতেন। যাহাদের স্পর্শ-জ্ঞান এমন প্রখর, তাহারা যে হাত বুলাইয়া পূর্ব্ব-প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে মুদ্রিত পুস্তক সকল বুঝিতে পারিবে না, তাহা সম্ভবপর বোধ হয় না।

সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি হস্ত-পরামর্শবলে শিক্ষা করা যাইতে পারে। কিন্তু গণিত শিক্ষা তাদৃশ সহজ নহে। ইহা শিক্ষা করিতে হইলে অন্ধদিগকে মানসিক শক্তির পরিচালনা করিতে হইবে। প্রথমে অন্ধবিদ্যালয়ে লিখন-কার্য্য শিক্ষা দেওয়া বিধেয়। কাগজে পিন দ্বারা বর্ণ-সমূহের অঙ্কন প্রণালী শিখাইলেই অন্ধদিগের লেখার কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারে। ইহাতে কেবল অন্ধগণ নহে, চক্ষুষ্মানগণও লেখা গুলি বুঝিতে পারিবেন। প্রেস্কটের

পরিচিতা একটী অন্ধ মহিলা পিন দ্বারা কাগজ স্ফুটিত করিয়া পত্রাদি লিখিতেন। অপর অন্ধগণ উক্ত কাগজে হস্ত পরামর্শ করিয়া লিখিত বিষয় অনায়াসে বুঝিত। চক্ষুষ্মানগণও আলোর নিকট উহা ধরিয়া লেখা গুলি সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেন। যাহা হউক, এই রূপ উপায় দ্বারা লিখন-প্রণালী অভ্যস্ত হইলে গণিত শিক্ষা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া উঠিবে।

সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করিতে অন্ধদিগকে বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না। সঙ্গীত শাস্ত্রের স্বরলিপি সমূহ পূর্ব্ব-প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে মুদ্রিত করা কর্ত্তব্য।

সীবন কার্য্য এবং নানাবিধ দ্রব্য নির্ম্মাণ শিক্ষা দিবার সময় অন্ধগণের সমক্ষে সেই সেই বিষয়ের এক একটী আদর্শ স্থাপন করা কর্ত্তব্য। অন্ধগণ হস্ত দ্বারা তাহার স্বরূপ অবগত হইলে বাচনিক উপদেশ প্রভৃতি দ্বারা তাহাদিগকে কার্য্য-প্রণালী শিক্ষা দেওয়া উচিত অন্ধদিগের অনেকানেক গুণ দেখিয়া দেশ-হিতৈষী হাউই সাহেব ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে পারী নগরীতে একটী অবৈতনিক অন্ধশিক্ষালয় স্থাপন করেন। এই শিক্ষালয় প্রসিদ্ধ ফরাসী বিপ্লব পর্য্যন্ত তাদৃশ সুফল প্রসব করে নাই। কিন্তু শেষে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ইহা ডাক্তর গিলিএর অধীন হইয়া আশানুরূপ ফল-প্রদ হইয়াছে। পারী নগরীর দৃষ্টান্তে ইংলণ্ড, স্কটলাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, রুসিয়া ও সুইট্‌জর্লাণ্ড প্রভৃতি দেশের প্রধান প্রধান নগরেও অন্ধবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই সমুদয় বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যর্থ হইতেছে না, প্রত্যুত উহা অন্ধদিগের মঙ্গলই সাধন করিতেছে।

৩য়। নিবাস-বাসী অন্ধদিগের শিল্পোৎপন্ন দ্রব্য সমূহ বিক্রয় করিয়া তদুৎপন্ন অর্থ দ্বারা নিবাস-রক্ষার মূলধন বৃদ্ধি করণ।

অন্ধনিবাস অন্ধদিগের স্বাধীনভাবে জীবিকা-সংস্থানের প্রধান

অবলম্বন। ইহার আশ্রয় না লইলে জীবিকা নির্ব্বাহ করা নিতান্ত কষ্টকর হইয়া উঠে। অন্ধনিবাস দ্বারা অন্ধদিগের যে কতদূর উপকার হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সাধু পিতা যেরূপ স্বীয় সন্তানদিগকে যথারীতি শিক্ষা দিয়া সংসারের উপযুক্ত করিতে সচেষ্ট থাকেন, অন্ধনিবাসও অন্ধদিগকে সেই রূপ উপযুক্ত করিতে চেষ্টা করে। ঈদৃশ হিতকর নিবাসের ভিত্তি দৃঢ়ীভূত করা উচিত। নিবাস-রক্ষণোপযোগী মূলধন সঞ্চয় করিলেই এই ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়া উঠিবে।

অন্ধনিবাসে শিল্প-শিক্ষা যথারীতি প্রবর্ত্তিত হইলে অন্ধগণ কর্ত্তৃক সময়ে সময়ে বিবিধ শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত হইবে। এই সমুদয় দ্রব্য সঞ্চিত করিয়া রাখিলে তাদৃশ ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। অন্ধদিগের শিল্পোৎপন্ন দ্রব্য সমূহ প্রদর্শনের জন্য সঞ্চয় করা উচিত, অনেকে এই রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু এরূপ প্রদর্শনের সহিত কোনও ফল-সংযোগ নাই। এই সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্য একটী গৃহে সুসজ্জিত করিয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলে একবারে প্রদর্শন ও অর্থলাভ দুইই হইতে পারে। বিক্রয়-লব্ধ অর্থ নিবাস-রক্ষার মূলধনের সহিত যোগ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে যে মূলধনের কিছু বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে অনুমাত্র সংশয় নাই। অন্ধনিবাস যাহাদিগের অদ্বিতীয় অবলম্বন স্বরূপ, তাহাদিগের পরিশ্রমজাত যৎকিঞ্চিৎ বিষয় ইহার নিমিত্ত ব্যয় করা অনুচিত নহে। কেহ কেহ অন্ধদিগের শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া, তাহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কিছু সংস্থান করিবার পরামর্শ দিতে পারেন। কিন্তু শিক্ষনীয় অবস্থাপন্ন অন্ধদিগের পক্ষে তাহা সঙ্গত বোধ হয় না। কি রূপে সুশিক্ষিত অন্ধদিগের জীবিকা-সংস্থান হইবে, পরবর্ত্তী উপায়ে তাহা যথারীতি বিবৃত হইতেছে।

৪র্থ। শিক্ষার পরিচয় গ্রহণ ও পুরস্কার স্বরূপ সুশিক্ষিত অন্ধদিগের জন্য সংসারে প্রবেশের উপযুক্ত সংস্থান করণ।

যিনি যে বিষয় শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হউন না কেন, এক এক সময়ে তাহার পরিচয় গ্রহণ করিলে অনেক ফল পাওয়া যায়। অপরীক্ষিত শিক্ষা জীবিকা সংস্থান বিষয়ে তাদৃশ ফলোপধায়িনী নহে। এ জন্য অন্ধশিক্ষালয়ে পরীক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা অতীব আবশ্যক বোধ হয়। অন্ধগণ যে বিষয় শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়া জীবিকা-নির্ব্বাহে সক্ষম হইয়াছে কি না, তাহার পরীক্ষা করিলেই যথেষ্ট হইবে। যাহারা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে, পুরস্কার স্বরূপ তাহাদিগের জন্য সংসারের উপযুক্ত কিছু সংস্থান করিয়া দেওয়া উচিত।

কিছু অবলম্বন না করিয়া সংসারে প্রথম প্রবেশ করিলে কষ্টে পড়িতে হয়। অন্ধগণ সেই সময়ে সাহায্য না পাইলে নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে। স্বশক্তি সমুত্থিত হওয়া বহুকাল-সাপেক্ষ। বিশেষতঃ অন্ধদিগের মধ্যে সেরূপ উন্নতি প্রায়ই দুর্লভ। এজন্য যে সকল অন্ধ সুশিক্ষিত বলিয়া বিবেচিত হইবে, শিক্ষিত বিষয়ানুসারে তাহাদিগের জীবিকার উপায় করিয়া দেওয়া নিবাসের অধ্যক্ষগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্ধগণ ঐ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক সংসারে প্রবেশ করিয়া শেষে স্বীয় ক্ষমতানুসারে উন্নতি লাভ করিতে পারিবে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে এসম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট উপায়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে না। ইহার নির্দ্দেশ-ভার অন্ধনিবাসের কর্ত্তৃপক্ষগণের উপরেই সমর্পিত হইতেছে। তাঁহারাই বিবেচনা করিয়া শিক্ষিত বিষয় অনুসারে অন্ধদিগের জন্য কোন রূপ সংস্থান করিয়া দিবেন। সহায়শূন্য ও দরিদ্র অন্ধদিগের নিমিত্তই যে

এই উপায় অবলম্বিত হইবে, তাহার উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। যাহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত, তাহাদের জন্য কোন রূপ সংস্থান না করিয়া দিলেও চলিতে পারে।

৫ম। সুশিক্ষিত অন্ধদিগ কর্ত্তৃক নিবাস-শিক্ষিত বিষয় অনুসারে যথারীতি ব্যবসায় অবলম্বন।

এই পঞ্চম ও শেষ উপায় কার্য্যে পরিণত হইলে, অন্ধদিগকে ভরণ পোষণের জন্য আর কোন রূপ কষ্ট পাইতে হইবে না। অন্ধগণ শিক্ষালয়ে যে বিষয়ে সুশিক্ষিত হয়, সেই বিষয় অবলম্বন করিয়াই আপনাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে। তাহারা যদি যথানিয়মে ব্যবসায় বিশেষের পরিচালনে সমর্থ হয়, তাহা হইলে পরমুখপ্রেক্ষী না হইয়া আপনাদের পোষ্যবর্গকেও প্রতি-পালন করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।

অনেকে কহিয়া থাকেন, গ্রীষ্মকালে পাখাটানা অন্ধদিগের জীবিকানির্ব্বাহের একটী উৎকৃষ্ট উপায়। একবার সংবাদপত্র-বিশেষেও ইহার আন্দোলন হইয়াছিল। কিন্তু পাখাটানা ইতর শ্রেণীর অন্ধদিগের কার্য্য। ভদ্র শ্রেণীর অন্ধগণ এমন কার্য্যে কখনও নিয়োজিত হইতে সম্মত হইবেন না; বিশেষতঃ সকল সময়ে পাখাটানা আবশ্যক হয় না, কেবল গ্রীষ্মকালেই ইহার প্রয়োজন পড়ে। এরূপ ক্ষণস্থায়ি কার্য্যের জন্য লালায়িত না হইয়া পূর্ব্ব-প্রদর্শিত উপায় অনুসারে জীবিকা নির্ব্বাহ করাই সৎপরামর্শ সিদ্ধ। তবে প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, ইতরশ্রেণীর অন্ধগণ এই কার্য্য করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে।

মানস সরোবর।

আমাদের দেশের অনেকের মুখেই মানস সরোবরের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। সাহিত্য-সংসারে এই সরোবর বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ। সংস্কৃত ও বাঙ্গালার কবিগণ প্রায়ই ইহার গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মানস সরোবর যেমন কবিতা দেবীর প্রিয়তম বিষয়, তেমনি পুণ্যসঞ্চয়েরও প্রধান উপায়। হিন্দু ও তিব্বত দেশীয়দিগের মতে মানস সরোবর দর্শন ও বেষ্টন করিলে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়।

মানস সরোবর প্রকৃতির যুগপৎ ভীষণ ও রমণীয় প্রদেশে অবস্থিত। ইহার প্রায় চারিদিকই অত্যুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণীদ্বারা পরিবেষ্টিত। দক্ষিণে ভীষণ-মূর্ত্তি হিমালয় ইহার তটদেশে ছায়া ঢালিয়া দিতেছে, পূর্ব্বে ধবল-কায় কৈলাস বিরাট পুরুষের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এবং উত্তরে ও পশ্চিমে অত্যুচ্চ দুর্গম পর্ব্বত মানক্ষেত্র, ত্রিশূল-কূট প্রভৃতির আকারে অবস্থান করিতেছে। এই সরোবরের আকার আয়ত ক্ষেত্রের ন্যায়। ইহার নিকটে বৃক্ষ-সমাকীর্ণ বনভূমি নাই; কেবল শুষ্ক তৃণ-গুল্মাদি বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। হ্রদের তটদেশের ভূমি শুষ্ক ও দৃঢ়, কোন পঙ্কিল বা কর্দ্দমময় স্থান নাই। জল স্বচ্ছ ও স্থির। জলের মধ্যে কোন প্রকার পানা অথবা তৃণ প্রভৃতি দেখা যায় না; কেবল জলের নিম্নে ঘাস জন্মিয়া তরঙ্গবেগে তীরে উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। মানসে স্বর্ণ নলিনীর আবির্ভাব কেবল কবি-কল্পনা মাত্র।

মানস সরোবরের পরিধি পঞ্চাশৎ মাইল। ইহা চারি দিনে বেষ্টন করা যায়। কেহ কেহ কহেন, তীর্থ যাত্রিগণ পাঁচ ছয় দিনে ইহার চারিদিক ঘুরিয়া আইসে। এই সরোবরে অনেক মৎস্য

পাওয়া যায়। পবিত্র স্থানের মৎস্য বলিয়া স্থানীয় লোকে ইহা ভোজন করে না। প্রবল ঝঞ্ঝাবেগে সরোবরে সময়ে সময়ে ভীষণ তরঙ্গ উত্থিত হয়। তরঙ্গাঘাতে জলস্থিত মৎস্য সকল তীরে উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। গ্রীষ্ম কালে হংস প্রভৃতি নানাবিধ পক্ষী এই সরোবরের নিকট বাস করে, কিন্তু শীতকাল উপস্থিত হইলেই ইহারা হিন্দুস্থানে চলিয়া যায়। এই জন্যই বোধ হয় আমাদের দেশের কবিগণ কহিয়া থাকেন, বর্ষা-সমাগমে হংস সকল মানস সরোবরে গমন করে।

কার্ত্তিক মাসে এই হ্রদের কিনারার জল জমিতে থাকে। কিন্তু বায়ুর প্রবল বেগ-প্রযুক্ত অগ্রহায়ণ মাস শেষ না হইলে উপরি-ভাগের সমস্ত জল জমে না। পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন মাসে সমস্ত সরোবর-জল কঠিন তুষারময় হইয়া যায়। এই সময় গবাদি পশু হাঁটিয়া মানস সরোবর পার হইয়া থাকে। চৈত্র মাসে কঠিন বরফ-রাশি ভাঙ্গিতে আরম্ভ হয়; বৈশাখে ভগ্ন বরফ-খণ্ড হ্রদের ইতস্ততঃ ভাসিতে থাকে। ইহার পর জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে সমস্ত হ্রদ পুনর্ব্বার জলময় হইয়া যায়।

পুরাণের মতে শতদ্রু নদী মানস সরোবর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে মানস সরোবর শতদ্রুর উৎপত্তি-স্থান নহে। ইঁহারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, রাবণ হ্রদ (নামান্তর লঙ্কা, লঙ্কেন, অথবা লঙ্কাচো) হইতে শতদ্রুর উৎপত্তি হইয়াছে। যাহা হউক; মানস সরোবরের সহিত কোন নদীর সংযোগ আছে কি না, তদ্বিষয়ে অনেকেই অনুসন্ধান করিয়াছেন। মুরক্রফট্ নামে একজন ভ্রমণকারী কোন নদী দেখিতে পান নাই; কিন্তু তিনি শুনিয়াছেন, পূর্ব্বে মানস সরোবরের সহিত রাবণ হ্রদের সংযোগ ছিল। গেরার্ড নামক অন্য এক জন ভ্রমণকারী অবগত হইয়াছেন, বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে একটী

বেগবতী স্রোতস্বতী দ্বারা মানস সরোবরের সহিত রাবণ হ্রদের সংযোগ ছিল। পার হইবার জন্য ইহার উপর সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল। এক্ষণে এই নদী শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তিব্বত দেশের যে সকল লোক মানস সরোবরের তটে বাস করে, তাহাদের বিশ্বাস, ভূগর্ভ দিয়া এই হ্রদের সহিত কোন জল-পথের সংযোগ আছে। চীন দেশের একজন রাজপুরুষ কহিয়াছেন, পূর্ব্বে একশতটী নদী এই সরোবরে পতিত হইত, ইহাদের একটী দ্বারা মানস সরোবরের সহিত রাবণ হ্রদের সংযোগ ছিল, এক্ষণে এই নদী শুকাইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, মানস সরোবরের জল সুস্বাদ ও স্বচ্ছ। কোন রূপ নদীর সহিত সংযোগ না থাকিলে জলাশয়ের জল এমন স্বাদু ও স্বচ্ছ হয় না। বদ্ধজল হ্রদের বারি প্রায়ই লবণাক্ত ও বিস্বাদ হইয়া থাকে। এই জন্য অনেকে অনুমান করেন, ভূগর্ভ দিয়াই হউক, অথবা ভূপৃষ্ঠ দিয়াই হউক, মানস সরোবরের সহিত কোন জলপথের সংস্রব আছে। চারি দিকে প্রকাণ্ড পর্ব্বতমালা বর্ত্তমান থাকাতে কেহ কেহ বিশ্বাস করেন, রাবণ হ্রদের ন্যায় মানস সরোবরেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী পতিত হয়। গ্রীষ্মকালে বহুসংখ্য ক্ষুদ্রনদী রাবণ হ্রদ হইতে বহির্গত হয়। কথিত আছে, ইহাদের একটী মানস সরোবরের সহিত মিলিত হইয়া থাকে।

সকলেই মানস সরোবরের জোয়ার ভাটার পরিমাণ করিয়াছেন। কোন প্রকার জলপথ না থাকিলে জোয়ার ভাটার পরিমাণ করা দুঃসাধ্য। সুতরাং সরোবর-জলের এই হ্রাস-বৃদ্ধিও জলপথের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটী প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

ভারতবর্ষের চারিটী প্রধান নদ ও নদী (সিন্ধু, শতদ্রু, ব্রহ্মপুত্র ও সরযূ) মানস সরোবরের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে নির্গত হইয়াছে।

সুতরাং এই স্থানের উচ্চতা অনেক অধিক। সমুদ্রতল হইতে মানস সরোবর অনুমান ১৭,০০০ ফীট উচ্চ। সাধু ও সংসার-পরিত্যাগী তপস্বিগণ সমস্ত বৎসর এই সরোবরের তটে বাস করে। যাত্রিগণ ইহাদিগকে যাহা কিছু দেয়, তাহাতেই ইহাদের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহিত হয়। মানস সরোবরের উচ্চতা ধরিলে বোধ হইবে, পৃথিবীতে মানব জাতির অধ্যুষিত যত স্থান আছে, তাহার মধ্যে এই তট-ভূমিই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত।

ভিন্ন দেশের অনেক গ্রন্থকার ও পর্য্যটক মানস সরোবরের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। মোগল সম্রাট আকবর সাহ যখন কাবুলে যাত্রা করেন, তখন একজন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করেন। ইনি তীর্থ-যাত্রিদের নিকট হইতে যে সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, মানস সরোবর সর্হিন্দের প্রায় ৩৫০ মাইল উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত। ইউরোপীয়গণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে পি আণ্ড্রাডা নামে একব্যক্তি ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে এই সরোবর দর্শন করেন। তাতারদিগের মধ্যে মানস সরোবর মেপাঙ্গচো নামে প্রসিদ্ধ।

মানস সরোবরের দৃশ্য অতি রমণীয়, মনোহর, ও গভীর ভাবের উদ্রেজক। ইহার যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, সেই দিকে দেখিবে, সুবিস্তৃত ও সমুন্নত পর্ব্বত দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মধ্য-ভাগে সুবিস্তীর্ণ স্বচ্ছ সরোবর, সরোবরের জলরাশির মধ্যভাগ হরিদ্বর্ণ। হংসকুল এই হরিদ্বর্ণ জল-রাশির মধ্যে মৃদুপবন-সঞ্চালিত তরঙ্গাবলির সহিত নাচিয়া বেড়ায়। সময়ে সময়ে এই ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা প্রবল বায়ুবেগে ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিয়া জড় জগতের অসীম শক্তি প্রকাশ করে। নিসর্গ-রাজ্যের এই ভীষণ ও কমনীয় শোভা নয়নের অনির্ব্বচনীয় প্রীতিকর। এই রূপ আলেখ্যবৎ-রমণীয়তা ও এই রূপ স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যবশতঃ

সুকবির রসময়ী লেখনী হইতে মানস সরোবরের গৌরব-কাহিনী নিঃসৃত হইয়াছে।

প্রতাপ সিংহ।

প্রতাপ সিংহ মিবারের রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। মিবারের রাজবংশীয়দিগের সাধারণ উপাধি 'রাণা'। রাণাগণ সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচিত। ইঁহারা কহিয়া থাকেন, রামচন্দ্রের পুত্র লব ইঁহাদের বংশের আদি পুরুষ। লব পঞ্জাবে লবকোট (আধুনিক লাহোর) নামে একটী নগর স্থাপন করেন। এই লবকোট বা লাহোরই রাণাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণের আদি নিবাসভূমি। লবের বংশধরগণ বহুকাল লাহোরে অবস্থান করেন, পরে ইঁহাদের অধিনেতা কনকসেন ১৫৮ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর হইতে দ্বারকায় যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। [illegible] অব্দে কনকসেন কর্ত্তৃক বীরনগর নামে একটী নগর স্থাপিত হয়। কনকসেনের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ বিজয়সেন, বিজয়পুর নামে আর একটী নগর স্থাপন করেন। বর্ত্তমান ধোল্কা এক্ষণে যে স্থলে আছে, অনেকে অনুমান করেন, বিজয়পুর সেই স্থলে অবস্থিত ছিল। বিজয়সেন, বিজয়পুর ব্যতীত বিদর্ভ নামে আরও একটী নগরের প্রতিষ্ঠাতা। বিদর্ভের পরিবর্ত্তে পরিশেষে এই নগরের নাম সিহোর হয়। যাহা হউক, বল্লভীপুরেই ইঁহাদের রাজধানী ছিল। কালক্রমে অসভ্য জাতির আক্রমণে বল্লভীপুর বিনষ্ট হইলে অধিবাসিগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করে। বল্লভীপুর-রাজ এই বিপ্লবে বিনষ্ট হয়েন, রাণীগণ ভর্ত্তার সহিত চিতানলে আত্ম-প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। কেবল অন্যতম রাণী পুষ্পবতী ঘটনাক্রমে স্থানান্তরে

থাকাতে এই ভীষণ বিপ্লব হইতে রক্ষা পান। জৈনদিগের গ্রন্থানুসারে এই বিপ্লব ৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত হয়।

বল্লভীপুর-ধ্বংসের সময় পুষ্পবতী গর্ভবতী ছিলেন। বল্লভীপুরের শোচনীয় সংবাদ তাঁহার নিকট পঁহুছিলে, তিনি একটী পর্ব্বত-গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই গুহায় তাঁহার একটী পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। পুষ্পবতী কমলাবতী নাম্নী একটী ব্রাহ্মণ-জায়ার হস্তে তনয়ের রক্ষার ভার সমর্পণ করিয়া ভর্ত্তার উদ্দেশে চিতারোহণ করেন। গুহায় জন্ম হওয়াতে পুষ্পবতী-তনয় গুহ নামে অভিহিত হয়েন। কালক্রমে গুহ পার্ব্বত্য প্রদেশের ভিলদিগের অধিনায়ক হইয়া উঠেন। এই গুহ হইতে 'গোহিলোট' (সাধারণতঃ গেলোট) শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

গুহের সন্তানগণ অষ্টম পুরুষ পর্য্যন্ত এই পার্ব্বত্য প্রদেশে আধিপত্য করেন। অষ্টম ভূপতির নাম নগাদিত্য। একদা অসভ্য ভিলগণ বিদেশীয় রাজার শাসনে উত্ত্যক্ত হইয়া নগাদিত্যের প্রাণ সংহার করে। নগাদিত্যের বাপ্পা নামে তিন বৎসর-বয়স্ক একটী পুত্র-সন্তান ছিল। একজন ভিল দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে ভাণ্ডিয়ার-দুর্গে আনিয়া রক্ষা করে। ভাণ্ডিয়ার হইতে বাপ্পা অধিকতর নিরাপদ-স্থল পরাশর-অরণ্যে আনীত হয়েন। এই অরণ্যের নিকটেই ত্রিকূট পর্ব্বত শির উত্তোলন করিয়া বিরাট্ পুরুষের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পর্ব্বতের পাদদেশে নগেন্দ্র নগর অবস্থিত। নগেন্দ্র নগর ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মণগণ এই স্থলে বেদপাঠে ও বেদোচিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে সমস্ত সময় যাপন করিতেন। এই পর্ব্বত-পাদ-দেশে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আশ্রয়-ক্ষেত্রে বাপ্পার শৈশবকাল অতিবাহিত হয়।

এই সময়ে চিতোর রাজ্য প্রমরাবংশীয় মোরী ভূপতিদিগের

শাসনাধীন ছিল। গুহের গর্ভধারিণী পুষ্পবতী প্রমরাবংশীয় চন্দ্রবতী-রাজের দুহিতা। গুহের বংশে বাপ্পা রাওর জন্ম, সুতরাং বাপ্পার সহিত প্রমরা-বংশের সম্বন্ধ ছিল। এই সম্বন্ধের বিষয় অবগত হইয়া বাপ্পা চিতোরে উপস্থিত হয়েন। চিতোরের তদানীন্তন নৃপতি বাপ্পাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া সেনাপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। বাপ্পা এইরূপে চিতোরের সেনাপতি হইয়া কিছুকাল যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। যুদ্ধে তাঁহার অসাধারণ বিক্রম প্রকাশিত হয়। কালক্রমে মোরী কুলের পতন হয়; এবং বাপ্পা ৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে চিতোরের সিংহাসন গ্রহণ করেন। কথিত আছে, যখন বাপ্পা রাও চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার বয়স পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র হইয়াছিল।

এই বাপ্পা রাও চিতোরের গোহিলোট বংশের সংস্থাপয়িতা এবং এই বাপ্পা রাও "হিন্দুকুল-সূর্য্য" বলিয়া রাজস্থানে সম্মানিত; চিতোর-ভূমি যে বীরকুলধাত্রী ও বীরকুলপ্রসবিনী হইয়া সহৃদয় কবির হৃদয়গত শ্রদ্ধা ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইয়া আসিয়াছে, এই বাপ্পা রাওই তাহার মূল। বাপ্পা রাওর বংশধরগণ অনেক-বার যবনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছিলেন, এবং অনেক বার যবনদিগকে পরাস্ত করিয়া রাজপুত নামের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। যখন পানীপথ-ক্ষেত্রে লোদিবংশের পতন ও মোগল বংশের অভ্যুদয় হয়, তখন বাপ্পা রাওর সন্তানগণ মিবারে সবিশেষ পরাক্রমশালী বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই প্রসিদ্ধ বংশে রাণা সঙ্গের ঔরসে উদয় সিংহের জন্ম হয়। রাণা সঙ্গ পুত্রের মুখ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই; উদয় সিংহের ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব্বেই ঘোর চক্রান্ত-জালে তাঁহার প্রাণবায়ুর অবসান হয়। যাহা হউক, উদয় সিংহের বয়স যখন ছয় বৎসর, তখন চিতোরের অন্তর্বিপ্লবে তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে।

উদয় সিংহ স্নেহময়ী ধাত্রী ও একজন বিশ্বস্ত ক্ষৌরকারের কৌশলে এই অন্তর্বিপ্লবের অধিনায়ক করাল শত্রু বানবীরের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করেন। রাণা সঙ্গের সন্তানের জন্য রাজপুত-ধাত্রীর এই কৌশল জগতের ইতিহাসে দুর্লভ। যে চিতোরের জন্য, বাপ্পা রাওর বংশ রক্ষার নিমিত্ত অবলীলাক্রমে স্নেহের অদ্বিতীয় অবলম্বন ও প্রীতির একমাত্র পুত্তলী শিশু সন্তানকে মৃত্যুমুখে সমর্পণ করে, তাহার স্বার্থত্যাগ কতদূর মহান্ ও কতদূর উচ্চভাবের পরিচায়ক! যে স্বদেশের গৌরব রক্ষার্থ হৃদয়রঞ্জন কুসুম-কলিকাকে বৃন্ত-চ্যুত দেখিয়াও আপনার কর্ত্তব্য সাধনে পরাঙ্মুখ না হয়, তাহার হৃদয় কতদূর তেজস্বিতা ও কতদূর স্বদেশ-হিতৈষিতার পরিপোষক, প্রকৃত তেজস্বী ও প্রকৃত দেশহিতৈষী ব্যতীত অন্য কেহ এই তেজস্বিনী নারীর হৃদয়গত মহান্ ভাব বুঝিতে পারিবেন না। ভীরু প্রকৃতি, ধাত্রীকে রাক্ষসী বলিয়া ঘৃণা করিতে পারে, কিন্তু তেজস্বিনী প্রকৃতি তাঁহাকে মূর্ত্তিমতী হিতৈষিতা বলিয়া চিরকাল যত্নের সহিত হৃদয়ে রক্ষা করিবে।

---

* বানবীরের সহিত গোহলোট বংশের কোনও সম্বন্ধ ছিল না। তিনি অন্যায় করিয়া চিতোরের সিংহাসন অধিকার করেন, এবং রাজ্য নিরাপদ করিবার জন্য রাণা সঙ্গের পুত্র উদয় সিংহকে বধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। একদা রাত্রিকালে উদয় সিংহ আহার করিয়া নিদ্রিত আছেন, এমন সময় একজন ক্ষৌরকার উদয় সিংহের ধাত্রীকে এই ভয়ানক সংবাদ জানায়। ধাত্রী তৎক্ষণাৎ একটী ফলের চাঙ্গাড়ির মধ্যে নিদ্রিত উদয় সিংহকে রাখিয়া এবং তাহার উপরিভাগ পাতা দিয়ে আচ্ছাদন করিয়া ক্ষৌরকারের হস্তে সমর্পণ করে। বিশ্বস্ত ক্ষৌরকার সেই চাঙ্গাড়ি লইয়া নিরাপদ স্থানে যায়। এমন সময় ঘাতকগণ আসিয়া, ধাত্রীর নিকট উদয় সিংহের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে ধাত্রী বাঙ্নিষ্পত্তি না করিয়া স্বীয় নিদ্রিত পুত্রের প্রতি অঙ্গুলি প্রসারণ করে। ঘাতকগণ উদয় সিংহ বোধে সেই ধাত্রী-পুত্রেরই প্রাণ সংহার পূর্ব্বক চলিয়া যায়। এদিকে ধাত্রী স্বীয় পুত্রের প্রেতকৃত্য সম্পন্ন করিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে ক্ষৌরকারের সহিত মিলিত হয়। এই ধাত্রীর নাম পান্না।

ফলে ধাত্রীর নিঃস্বার্থ হিতৈষণা তাহার রাক্ষসী-ভাবকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সাধারণে এমন অসাধারণ ভাব মনেও ধারণা করিতে পারে না। যাবৎ হিতৈষণা ও তেজস্বিতার সম্মান থাকিবে, তাবৎ এই স্বার্থত্যাগ ও তেজস্বিনী পান্নার নাম কখনও ইতিহাস হইতে বিলুপ্ত হইবে না।

চিতোর হইতে পলায়নের পর উদয় সিংহ বহুকাল পান্নার তত্ত্বাবধানে দেশান্তরে রক্ষিত হয়েন। কালক্রমে মিবারের সর্দ্দারগণ উদয় সিংহকেই চিতোরের বিধিসঙ্গত রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। উদয় সিংহের অনুকূলে মিবারের প্রধান প্রধান লোক সমবেত হইয়া যুদ্ধ উপস্থিত করাতে বানবীর চিতোর পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে যাইতে অনুমত হয়েন, সুতরাং উক্ত রাজ্য উদয় সিংহের অধীন হয়। এই রূপে মহাপরাক্রান্ত সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বহুকাল দেশান্তরে অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া, উদয় সিংহ ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে বাপ্পা রাওর সিংহাসনে সমাসীন হয়েন। রাজ্য-প্রাপ্তির কিছু পূর্ব্বে তিনি ঝালোররাওর দুহিতার পাণি গ্রহণ করেন। এই দম্পতী-সম্মিলনেই প্রতাপ সিংহের উৎপত্তি হয়।

প্রতাপসিংহ কোন্ সময়ে জন্ম গ্রহণ করেন, রাজস্থানের ইতিহাসে তাহার কোন উল্লেখ নাই। তবে তাঁহার সমকালে রাজস্থানের নিতান্ত শোচনীয় দশা উপস্থিত হয়। মোগলদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণই এই দশাবিপর্য্যয়ের একমাত্র কারণ। এই আক্রমণের সময় ধরিলে প্রতীত হইবে, প্রতাপসিংহ ষোড়শ শতাব্দীর শেষে ভূমিষ্ঠ হয়েন। যাহা হউক, যে সময়ে বাপ্পা রাওর টীকা প্রতাপের ললাটদেশ শোভিত করে, সে সময়ে বীর-প্রসবিনী চিতোর ভূমি কিরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছিল, একণে তাহা বর্ণিত হইতেছে।

রাজস্থানের প্রসিদ্ধ কবি চাঁদ বর্দ্দে কহিয়াছেন, "যে স্থানে নাবালক রাজত্ব করে, কিম্বা স্ত্রীলোক শাসন-কার্য্য চালায়, সে স্থানকে ধিক্। যে স্থলে এই উভয়ের সমাবেশ হয়, সে স্থলের দুর্দ্দশার আর ইয়ত্তা থাকে না।" চিতোর-রাজ উদয় সিংহ এই নাবালক ও নারী, উভয়েরই প্রকৃতি ও ধর্ম্ম অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ যে তেজস্বিতা ও বীরত্বের আধার ছিলেন, সেই তেজস্বিতা ও বীরত্বে উদয় সিংহের প্রকৃতি সমুন্নত হয় নাই। উদয় সিংহ প্রকৃতপক্ষে নিতান্ত ভীরু ও কাপুরুষ ছিলেন। প্রতাপ সিংহের জন্মদাতার এরূপ নিস্তেজ নারী-প্রকৃতি বীরভূমি চিতোরের ইতিহাসে দুর্লভ। এই সময়ে আকবরের ন্যায় একজন সুযোদ্ধা ও দিগ্বিজয়-পটু সম্রাট্ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত না থাকিলে উদয় সিংহ চিতোরে সংযত-চিত্ত তপস্বীর ন্যায় কালাপাতিপাত করিতে পারিতেন। কিন্তু বিধাতা উদয় সিংহের ললাটে সেরূপ শান্তি লিখেন নাই। সুতরাং চিতোরে থাকিয়াই তিনি শান্তি-সুখের অধিকারী হইতে পারিলেন না। এই সুখ-লাভের আশায় তাঁহাকে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইল। তবে কি রাজপুত বিলাস-সুখের জন্য লালায়িত? তবে কি রাজপুতের হৃদয় বিকৃত ও রাজপুতনা পূর্ব্ব-গৌরব ভ্রষ্ট? রাজস্থানের ধর্ম্মাপোলি ও কাঙ্গ্রা (দুর্গ-প্রাকার) তবে কি অলীক? ইতিহাসের অনুসরণ কর, এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর পাইবে।

যে বৎসর উদয় সিংহের রাজ্য-প্রাপ্তিতে কমলমিয়রের প্রাসাদ হইতে আনন্দ-কোলাহল সমুত্থিত হয়, সেই বৎসরই ক্রন্দন-ধ্বনির মধ্যে অমরকোটে একটী বালক জন্ম গ্রহণ করে। কমলমিয়রের আনন্দ-স্বর সমস্ত মিবারে পরিব্যাপ্ত হয়, অমরকোটের শোক-স্বর নগর-প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া বৃক্ষলতা-শূন্য বিজন মরুভূমির বায়ুর সহিত মিশিয়া যায়। উদয় সিংহ সিংহাসনে অধিরোহণ

করাতে কমলমিয়রের ভূমনগণ সমবেত ব্যক্তিদিগকে মুক্তহস্তে ধন দান করে, অমরকোটের বালক জন্মগ্রহণ করাতে তাহার পিতা অন্য সম্পত্তির অভাবে একটী সামান্য কস্তুরী খণ্ড খণ্ড করিয়া সমবেত বন্ধু-জনের মধ্যে বিতরণ করেন। এক সময়ে চিতোরের উদয় সিংহের সহিত অমরকোটের বালকের এইরূপ প্রভেদ ছিল, এক সময়ে একের সিংহাসনাধিরোহণ ও অপরের জন্মগ্রহণ এই রূপ বিসদৃশ ঘটনায় সূচিত হইয়াছিল। কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল সময়ের সহিত পরিশেষে এই মরু-প্রান্তবর্ত্তী বালকের অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হয়। কালে এই বালকের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ হিমালয় হইতে সুদূর কুমারীকা পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া পড়ে, এবং কালে এই বালকের উদ্দেশে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" ধ্বনি ইন্দ্রপ্রস্থের বিচিত্র আমখাস হইতে সমুত্থিত হইয়া সুদূর গগনতলে বিলীন হয়।

এই বালকের নাম আকবর; হোমায়ুন যখন রাজ্যভ্রষ্ট, শ্রীভ্রষ্ট হইয়া দেশান্তরে পলায়িত, তখন বিস্তীর্ণ ভারত-মরুর এক খণ্ড ওয়েসিসে প্রাচীন সগাদিবংশীয়গণের মধ্যে ভারতের এই ভাবী সম্রাট্ ভূমিষ্ঠ হয়েন। হোমায়ুন যে রূপে রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া দুরবস্থায় পড়েন, তাহা ইতিহাসে সবিশেষ বর্ণিত আছে। এস্থলে তদ্বিষয় উল্লেখের কোনও প্রয়োজন নাই; কেবল ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পুত্রের জন্ম-সময়ে হুমায়ুনের ললাট হইতে রাজ-টীকা বিচ্যুত হইয়াছিল, হস্ত হইতে রাজ-দণ্ড অপহৃত হইয়াছিল এবং দেহ হইতে রাজ-পরিচ্ছদ অপসারিত হইয়াছিল, দিল্লীর অর্দ্ধ চন্দ্র-শোভিত পতাকা মোগলের পরিবর্ত্তে সুরবংশের শাসন চিহ্ন প্রকাশ করিতেছিল, এবং দিল্লীর রত্নখচিত সিংহাসন মোগল-বংশীয়ের পরিবর্ত্তে সুরবংশীয় সের শাহের দৈহ-কান্তিতে শোভিত হইতেছিল।

প্রতাপসিংহ।

হোমায়ুন রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া দেশান্তরে দ্বাদশ বর্ষকাল অতিবাহিত করেন। এই অনতি-দীর্ঘ সময়ের মধ্যে শূরবংশীয় ছয় জন নৃপতি ক্রমে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সর্ব্ব শেষ ভূপতির নাম সেকন্দর। ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে আকবরের পরাক্রমে সেকন্দর শূর পরাজিত ও রাজ্য হইতে তাড়িত হয়েন। এই সময়ে আকবরের বয়স দ্বাদশ বৎসর, এই বয়সেই তাঁহার পিতামহ ফর্গনার সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। সেকেন্দরের পর হোমায়ুন পুনরায় দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব-সুখ ভোগ করিতে পারেন নাই। রাজ্য-পুনঃপ্রাপ্তির ছয় মাস পরে তিনি একদা স্বীয় পুস্তকালয়ের সিঁড়ি হইতে পতিত হইয়া দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হন। এই আঘাতেই তাঁহার প্রাণবায়ুর অবসান হয়। প্রাচ্য নৃপতিগণ পুস্তকালয়ে থাকিয়া পুস্তক পাঠে অনেক সময় যাপন করিতেন। তাঁহাদের নিকট লক্ষ্মীর ন্যায় সরস্বতীরও সমাদর ছিল, তাঁহাদের সভা পণ্ডিত-মণ্ডলীতে সর্ব্বদা উজ্জ্বল থাকিত। ফ্রান্সের চতুর্থ হেনরি অথবা ইংলণ্ডের এলিজাবেথও এবিষয়ে প্রাচ্য ভূপতিদিগকে অতিক্রম করিতে পারেন না। জমশিদ্ হইতে মোগল বংশ পর্য্যন্ত সকলের সভাতেই বিদ্বানের সমাদর ছিল। প্রাচ্য দেশের সভামণ্ডপ যে সমস্ত কবি, ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও গণিতবিৎ প্রভৃতিতে গৌরবান্বিত থাকিত, ইতিহাস হইতে তাঁহাদের নাম ও কীর্ত্তিকলাপ কখনও বিলুপ্ত হইবে না।

হোমায়ুনের মৃত্যুর পর আকবর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ সময়ে সাম্রাজ্যের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ছিল। হোমায়ুনের রাজ্যচ্যুতির পর অধিকাংশ প্রদেশই একে একে দিল্লীর শাসন-ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। আকবর ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে এইরূপ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল সাম্রাজ্যের অধিপতি হইলেন। কিন্তু

বহরাম খাঁর সাহস ও কার্য্য-পরায়ণতায় দিল্লীর সাম্রাজ্য পুনর্ব্বার পূর্ব্বাবস্থাপন্ন হইল। বহরাম কাল্পী, চন্দেরী, কলিঞ্জর, বুন্দেলখণ্ড ও মালব দিল্লীর অধীন করিলেন। ভারতীয় সলি* এই রূপে ভারতের হৃদয়ে মোগল-শাসন বদ্ধমূল করিয়া পরিশেষে এই মোগল শাসনের বিরুদ্ধেই অস্ত্র ধারণ করেন। যাহা হউক বহরামের বিদ্রোহভাবে আকবরের কোন অনিষ্ট হইল না। আকবর অবিলম্বে অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে সাম্রাজ্যের শাসন-ভার গ্রহণ করিয়া নিজের ইচ্ছানুসারে শাসন-দণ্ড পরিচালন করিতে লাগিলেন।

সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত হইলে আকবর দিগ্বিজয়ে মনোনিবেশ করেন। মালদেবের শত্রুতার প্রতিশোধের জন্যই হউক, অথবা অন্য কারণেই হউক, রাজপুত-রাজ্যই তাঁহার লক্ষ্য হইয়া উঠে। আকবর মাড়বারের একটী নগর নষ্ট করিয়া ১৫৬৭ অব্দে চিতোরের বিরুদ্ধে সৈন্য চালন করেন।

যে রাজ্যে রাজত্ব আইনে নিবদ্ধ, রাজা কেবল প্রধান মাজিষ্ট্রেটের ন্যায় আইনের অনুগামী, সেই রাজ্য কি সুখময়! কিন্তু যে রাজ্যে আইনই রাজার অনুগামী, সেই রাজ্যের মঙ্গল অমঙ্গল রাজারই অনুগত হইয়া থাকে। রাজা ধর্ম্ম-পরায়ণ হইলে সেই রাজ্য উন্নতির শিখরে সমারূঢ় হয়, রাজা পাপ-পরায়ণ হইলে সেই রাজ্য অবনতির চরম সীমায় পতিত হইয়া থাকে। রাজা শৌর্য্য, বীর্য্য ও সাহস-সম্পন্ন হইলে সেই রাজ্য অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে অটল থাকে, রাজা ভীরু স্বভাব হইলে হইলে সেই রাজ্য শত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত ও উৎসন্ন হইয়া যায়। দিল্লীর আকবর সাহ ও চিতোরের উদয় সিংহে এই শেষোক্ত রাজত্ব পরিস্ফুট হইবে।

---

* সলি ফ্রান্সের অধিপতি চতুর্থ হেনরীর রাজস্ব-সচিব ছিলেন। রাজনীতিতে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল।

উদয় সিংহ যে বয়সে চিতোরের অধিপতি হয়েন, আকবরও সেই বয়সে দিল্লীর শাসন-দণ্ড গ্রহণ করেন। উভয়ের মধ্যে এই রূপ বয়ঃক্রমের সাদৃশ্য থাকিলেও অন্যান্য অনেক বিষয়ে বৈসাদৃশ্য ছিল। হোমায়ুন ববরের নিকটে যে রূপ কষ্ট-সহিষ্ণুতা শিক্ষা করিয়াছিলেন, আকবরও হুমায়ুনের নিকটে সেইরূপ কষ্ট-সহিষ্ণুতা অভ্যাস করেন। পিতামহের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আকবর ক্রমে কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রম-শীল হইয়া উঠেন। এদিকে বহরাম খাঁ, আবুল ফজিল ও তোডর মল্লের ন্যায় বিচক্ষণ যোদ্ধা ও রাজনীতিজ্ঞগণ শাসন-কার্য্যে আকবরের সাহায্যকারী হয়েন। যে সৌভাগ্য-নক্ষত্র তাঁহার জন্ম সময়ে অমরকোটের মরুভূমি উদ্দীপ্ত করিয়াছিল, দিল্লীর রাজত্ব-সময়ে ক্রমেই তাহা উজ্জ্বল হইতে থাকে। উদয় সিংহ এমন সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারেন নাই, এমন কষ্ট-সহিষ্ণু হইয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন নাই। মোগল ও রাজপুতের মধ্যে এইরূপ সৌভাগ্য ও শাসনোচিত ক্ষমতার বৈষম্য ছিল। একজন অদৃষ্টের বিপাকে পড়িয়া, নানা স্থানে যাইয়া মানব-চরিত্রে বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, অন্য জন প্রাকার-বেষ্টিত পর্ব্বত-দুর্গে জন্মিয়া সঙ্কুচিত বিষয়ের সঙ্কুচিত সীমায় আবদ্ধ ছিলেন। অবারিত সংসার এক জনের বৈষয়িক জ্ঞান প্রসারিত করিয়াছিল,— সঙ্কীর্ণ গিরিকন্দর অপরের বৈষয়িক জ্ঞান সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ রাখিয়াছিল।

আকবর মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃত সংস্থাপয়িতা। তিনিই প্রথমে রাজপুত স্বাধীনতার গৌরব হরণ করেন। সাহেবউদ্দীন ও আলার ন্যায় তিনিও রণমত্ত রাজপুতদিগকে তরবারির আঘাতে খণ্ড খণ্ড করেন। যে ধর্ম্মান্ধতা পাঠান-রাজত্বে আধিপত্য করিয়াছিল, তাহা মোগল সাম্রাজ্যের শিরোভূষণ আকবরের রাজত্বেও পরিস্ফুট হয়। আকবর আলার ন্যায় রাজপুতের আরাধ্য

একলিঙ্গের মন্দিরের উপকরণ দ্বারা, আপনাদিগের ধর্ম্মপুস্তক কোরাণের জন্য মঞ্চ (বেদি) নির্ম্মাণ করিতেও ত্রুটী করেন নাই। এরূপ অন্ধ-বিশ্বাসী হইলেও এক সময়ে আকবরের কীর্ত্তিতে মোগল সাম্রাজ্য উদ্ভাসিত হইয়াছিল, এবং এক সময়ে আকবর অসীম প্রতাপ-শালী হইয়া চতুর্দ্দিকে আপনার মহিমা বিস্তার করিয়াছিলেন।

আকবর সৈন্যদল লইয়া চিতোর আক্রমণ করিলে উদয় সিংহ জয়মল নামক বিদনোরের প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীরের হস্তে নগর রক্ষার ভার দিয়া স্বয়ং অবসর গ্রহণ করেন। জয়মল সাহস, বীরত্ব প্রভৃতি শূরোচিত গুণ-সমূহে সমলঙ্কৃত ছিলেন; তিনি বিশিষ্ট দক্ষতার সহিত চিতোর রক্ষার বন্দোবস্ত করেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে চিতোর দীর্ঘকাল তাঁহার রক্ষাধীন থাকে না। জয়মল একদা রাত্রিকালে মশালের আলোকে নগরের ভগ্ন প্রাচীরের সংস্করণ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে আকবর সাহ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, লক্ষ্য শুদ্ধি পূর্ব্বক তৎপ্রতি গুলি নিক্ষেপ করেন। গুলির আঘাতে জয়মলের তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়। এইরূপ গুপ্ত হত্যা আকবরের চরিত্রের একটী দেদীপ্যমান কলঙ্ক। সম্মুখযুদ্ধ করাই যুদ্ধবীরের চিরন্তন পদ্ধতি, গোপনে নিরস্ত্র শত্রুর প্রাণসংহার করা নৃশংসতা ও কাপুরুষতার লক্ষণ। বলা বাহুল্য, আকবর অন্যান্য সদ্গুণের অধিকারী হইয়াও উপস্থিত স্থলে এইরূপ নৃশংসতা ও কাপুরুষতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

সেনাপতির বিরহে চিতোর-বাসিগণ ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়ে। এদিকে যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের প্রধান প্রধান বীরগণের পতন হয়। অবশেষে পুত্ত চিতোর-সৈন্যের পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। পুত্ত ষোড়শবর্ষীয় বালক। কিন্তু এই বালকের হৃদয় সাহসে

পূর্ণ ছিল। বস্তুতঃ শৌর্য্য ও বীর্য্যে পুত্ত পৃথিবীর [illegible] দেবতা, স্বদেশ-বৎসলতার জন্য পুত্তের নাম [illegible] নিবেশিত হইবার যোগ্য। পিতা রণস্থলে দেহ ত্যাগ করিলে পুত্ত [illegible]ীর সাহস সহকারে যুদ্ধে যাইতে সমুদ্যত হয়েন। স্পার্টার মহিলার ন্যায় তাঁহার মাতা তাঁহাকে সমর-সজ্জায় সজ্জিত করিয়া "রণস্থল হইতে পলায়ন অপেক্ষা জন্মভূমির রক্ষার নিমিত্ত মৃত্যুও শ্রেয়স্কর" বলিয়া বিদায় দেন। পুত্ত মাতৃ-আজ্ঞা পালনে প্রতিশ্রুত হইয়া রণক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। পুত্তের অসাধারণ পরাক্রমে যবন সৈন্য বিধ্বস্ত-প্রায় হইয়া উঠে। এইরূপ লোকাতীত উৎসাহ সহকারে যুদ্ধ করিয়া পুত্ত মাতৃ-আজ্ঞা পালন করেন। আকবর সাহ শত্রুর সুরোচিত গুণ বিস্মৃত হয়েন নাই। তিনি এবিষয়ে বিশিষ্ট উদারতা দেখাইয়া প্রকৃত যুদ্ধবীরের সম্মান রক্ষা করেন। জয়মল ও পুত্তের বীরত্বে আকবরের হৃদয় এতদূর আকৃষ্ট হয় যে, তিনি স্বীয় লেখনীতে তাঁহাদের অক্ষয় কীর্ত্তি বর্ণনা করিতে ক্রুটী করেন নাই। এতদ্ব্যতীত আকবর তাঁহার দিল্লীস্থ প্রাসাদ-দ্বারের উভয় পার্শ্বে দুটী প্রকাণ্ডাকার হস্তী নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার উপর জয়মল ও পুত্তের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করেন। বিখ্যাত ভ্রমণকারী বার্ণিয়ারের সময়েও এই প্রতিমূর্ত্তিদ্বয় যথাযথ অবস্থায় ছিল। আকবর এইরূপে পরাক্রান্ত শত্রুর মর্যাদা রক্ষা করিয়া প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

পুত্তের প্রাণ-বায়ুর সহিত চিতোরের সৌভাগ্য অন্তর্হিত হয়। চিতোরবাসিগণ অবিলম্বে শোচনীয় জোহরের অনুষ্ঠান করে। আট সহস্র রাজপুত একত্রিত হইয়া শেষ বীরা* ভোজনে প্রবৃত্ত

* বীরা অর্থাৎ সজ্জিত তাম্বুল। বিদায়-সময়ে রাজপুতদিগের মধ্যে বীরা-প্রদানের পদ্ধতি আছে।

হয়। অপরদিকে রাজপুত-মহিলাগণের চিতানলের শিখা গগন-স্পর্শী হইয়া উঠে। এইরূপ করাল নরশোণিত-প্রবাহ ও করাল হুতাশন-শিখা দেখিয়া চিত্তোর-রাজলক্ষ্মী জন্মের মত চিত্তোর হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

কার্থেজের প্রসিদ্ধ হানিবল 'কানি' সমরে জয়ী হইলে আপনার কৃতকার্য্যতার পরিচয়ার্থ রোমীয়দিগের অঙ্গুরীয়ক সমূহ আহরণ করিয়া, ধামা দ্বারা পরিমাণ করিয়াছিলেন। আকবরও এইরূপে রাজপুতদিগের গলাভরণ সমূহ (জিনার) উন্মোচন করিয়া পরিমাণ করেন। পরিমাণে এই আভরণ ৭৪½ মণ হয়। রাজস্থানের ব্যবসায়িগণের পৃষ্ঠে এই ৭৪½ এর অঙ্কপাতের পদ্ধতি আছে। ইহার অর্থ এই, যাঁহারা এই পত্র উন্মোচন করিবেন, চিত্তোর-ধ্বংসের সমস্ত প্রত্যবায়-ভার তাঁহাদের স্কন্ধে পতিত হইবে। অনেক স্থানে অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পদ্ধতির প্রচার দৃষ্ট হয়। বহুশত বৎসর অতীত হইল, চিত্তোর বিধ্বস্ত হইয়াছে, অদ্যাপি ৭৪½ পত্র-পৃষ্ঠে জাজ্জ্বল্যমান থাকিয়া এই শোচনীয় সংবাদ সাধারণের কাণে কাণে কহিয়া বেড়াইতেছে।

উদয় সিংহ চিত্তোর পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে আরণ্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন, পরিশেষে তথা হইতে অর্ব্বলী পর্ব্বতের উপত্যকায় উপস্থিত হন। চিত্তোর-ধ্বংশের পূর্ব্বে উদয় সিংহ এই উপত্যকার প্রবেশ-পথে একটী হ্রদ খনন করাইয়া তাহার নাম 'উদয়সাগর' রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি এই স্থানে একটী নগর স্থাপন করিয়া নিজের নামানুসারে উহার নাম 'উদয়পুর' রাখেন।

উদয় সিংহ চিত্তোর-ধ্বংশের পর চারি বৎসর জীবিত ছিলেন। ৪২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার ২৫টী পুত্র সন্তানের মধ্যে প্রতাপ সিংহ পৈত্রিক উপাধি ও গদির উত্তরাধিকারী হন।

এইরূপে প্রতাপ বংশানুগত "রাণা" উপাধি ধারণ করিলেন, এইরূপে মিবারের গৌরব-সূর্য্য সমুজ্জ্বল হইবার সুত্রপাত হইল। যদিও চিতোর বিধ্বস্ত হইয়াছিল, যদিও যবনের পরাক্রমে রাজপুত গণ হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি প্রতাপের হৃদয় বিচলিত হয় নাই। তিনি চিতোর উদ্ধার করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতক্ষণ বাপ্পা রাওর মন্ত্রপূত শোণিতের শেষ বিন্দু ধমনীতে বর্ত্তমান থাকিবে, ততক্ষণ তিনি এই সঙ্কল্প হইতে বিরত হইবেন না; প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতক্ষণ গোহিলোট বংশের গৌরব মিবারের ইতিহাসে অঙ্কিত থাকিবে, ততক্ষণ তিনি মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিবেন না। প্রতাপ এইরূপ স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়া উদ্দেশ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। উচ্চতর সঙ্কল্প, মহত্তর সাধনা তাঁহার হৃদয়কে উচ্চতর করিয়া তুলিল। তিনি স্বদেশ-হিতৈষণা, স্বজাতি-প্রিয়তায় উদ্দীপ্ত হইয়া অনুচর বর্গকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। প্রতাপের এইরূপ উৎসাহ, এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা দেখিয়া অনেকে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল বটে, কিন্তু প্রধান প্রধান রাজপুতগণ মোগলের পক্ষ অবলম্বন করিলেন, মাড়বার, আম্বর, বিকানীর এবং বুঁদীর অধিপতিগণও স্বজাতি-প্রিয়তায় জলাঞ্জলি দিয়া আকবরের পক্ষ সমর্থনে ত্রুটী করিলেন না। অধিক কি, তাঁহার ভ্রাতাও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া শত্রু দলে মিশিলেন। কিন্তু দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ প্রতাপ ইহাতেও হতাশ্বাস হইলেন না; তিনি বাপ্পা রাওর শোণিত কলঙ্কিত না করিয়া স্বদেশের উদ্ধার সাধনার্থ স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিলেন।

প্রতাপ এইরূপে স্বজাতি—স্ববন্ধু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ২৫ বৎসর কাল দুর্ব্বারপরাক্রম মোগল-শাসনের বিরুদ্ধাচরণ করেন। এই সময়ে এক এক বার তাঁহার দুরবস্থার এক শেষ হয়। স্বয়ং পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইয়া স্ত্রী পুত্রের সহিত পার্ব্বত্য

বন্ধ থাইয়া কষ্টে জীবনাতিপাত করেন, তথাপি তিনি মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। এরূপ স্বাধীনত্ব-প্রিয়তা পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ।

চিতোর-ধ্বংসের স্মরণার্থ প্রতাপ সর্ব্বপ্রকার বিলাস দ্রব্যের উপভোগ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্র পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষ পত্রে অন্ন আহার করিতেন, দুগ্ধফেণ-নিভ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া তৃণাচ্ছাদিত শয্যায় শয়ন করিতেন এবং ক্ষৌর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া লম্বমান দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখিতেন। তাঁহার আজ্ঞায় অগ্রবর্ত্তী রণ-দুন্দুভি সকলের পশ্চাতে ধ্বনিত হইত। মিবারের এই শোক-চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে. অদ্যাপি প্রতাপের বংশীয়গণ স্বর্ণ ও রৌপ্যময় আহার-পাত্রের নীচে বৃক্ষ-পত্র ও শয্যার নীচে তৃণ রাখিয়া থাকেন।

প্রতাপ পৈত্রিক গদিতে আরোহণ করিয়া কতিপয় অভিজ্ঞ সর্দ্দারের সাহায্যে শাসন-কার্য্য ও রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়ের উৎকর্ষ সাধন করিতে লাগিলেন; যে কএকটী পার্ব্বত্য দুর্গ হস্তে ছিল, তৎসমুদয় দৃঢ়ীভূত করিলেন। যত দিন মোগলদিগের সহিত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, তত দিন তাঁহার আজ্ঞায় বনাস ও বেরিস্ নদীর উভয় তীরবর্ত্তী উর্ব্বর ভূমিতে কেহই থাকিতে পারেত না। নিজের আদেশ যথাবিধি পালিত হয় কি না, তাঁহার প্রতি প্রতাপের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তিনি প্রায়ই কতিপয় অশ্বারোহি সমভিব্যাহারে স্থানীয় লোকের কার্য্য কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তাঁহার কঠিন আদেশে মরুভূমির নিস্তব্ধতা উর্ব্বর ক্ষেত্র পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল, তৃণরাজি শস্য-সমূহের স্থান পরিগ্রহ করিয়াছিল, গন্তব্য পথ কণ্টকাকীর্ণ বাব্‌লা বৃক্ষে অগম্য হইয়াছিল এবং মনুষ্যের আবাস-ভূমি বিবিধ বন্যজন্তুর বিহার-ক্ষেত্র হইয়াছিল। প্রতাপ এই রূপে সমুদায় ভূমি জঙ্গল-

মন্ন করিয়া বিজেতা মোগলদিগের ল্যর্ডের পথ অবরুদ্ধ করিয়া ছিলেন।

যে সমস্ত রাজপুত মোগলদিগের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, প্রতাপ তাঁহাদিগকে নিরতিশয় ঘৃণা করিতেন। অাম্বরের রাজা মানসিংহের সহিত আকবরের এই রূপ সম্বন্ধ থাকাতে প্রতাপ মানসিংহের সহিত সমুদায় সামাজিক সম্বন্ধ উঠাইয়া দেন। একদা মানসিংহ সোলাপুর অধিকার করিয়া হিন্দুস্থানে আসিতেছিলেন, এমন সময়ে প্রতাপের সহিত সাক্ষাৎকারের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। প্রতাপ সিংহ এই সময়ে কমলমিররে অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি অাম্বরাধীশ্বরের অভিনন্দন জন্য উদয়-সাগরের তীরে উপস্থিত হইলেন। অবশেষে এই স্থানে একটী সমৃদ্ধ ভোজের আয়োজন হইল, প্রতাপের পুত্র কুমার ওমরা রাজা মানের অভ্যর্থনার জন্য এই স্থলে উপস্থিত ছিলেন; মান-সিংহ নির্দিষ্ট স্থলে সমাগত হইলে ওমরা, পিতার অনুপস্থিতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে ভোজন-স্থলে বসাইলেন। মানসিংহ প্রতাপের সহিত একত্র ভোজন করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করাতে প্রতাপ মুখ ... করে কহিলেন, যিনি তুরুককে নিজের ভগিনী সম্প্রদান করিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ যিনি তুরুকের সহিত আহারও করিয়াছেন, তিনি তাঁহার সহিত একত্র ভোজন করিতে পারেন না। রাজা মান প্রতাপ সিংহের এই বাক্যে অপমান জ্ঞান করিয়া ভোজন-স্থল হইতে গাত্রোত্থান করেন; প্রতাপ সিংহ এই সময়ে ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, রাজা মান অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কহেন, "যদি আমি তোমার গর্ব্ব খর্ব্ব না করি, তাহা হইলে আমার নাম মানসিংহ নহে"। মানসিংহ এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলে পবিত্র গঙ্গাজল দ্বারা ভোজন-স্থান ধৌত করা হয়, এবং

যাঁহারা এই ভোজের সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন, তাঁহারা স্নান করিয়া বস্ত্রান্তর গ্রহণ করেন। এই সমস্ত বিবরণ আকবরের শ্রুতি-প্রবিষ্ট হইলে, আকবর মানসিংহের প্রতি প্রতাপ সিংহের তাদৃশ ব্যবহারে আপনাকে যার পর নাই অপমানিত জ্ঞান করিলেন। অবিলম্বে এই অপমানের প্রতিশোধ জন্য সংগ্রামের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল। যুবরাজ সেলিম সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া মানসিংহ ও মহব্বত খাঁর সহিত প্রতাপের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

প্রতাপ দ্বাবিংশতি সহস্র রাজপুতের সাহস ও স্বদেশীয় পর্ব্বতমালার উপর নির্ভর করিয়া আকবর-তনয়ের গতি প্রতিরোধার্থ দণ্ডায়মান হইলেন। যে স্থলে তাঁহার সৈন্য সন্নিবেশিত হয়, তাহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার প্রায় আট মাইল। এই স্থান কেবল পর্ব্বত, অরণ্য ও ক্ষুদ্র নদীতে সমাবৃত। ইহার উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ সকল দিকেই অত্যুচ্চ পর্ব্বত লম্বভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই গিরি-সঙ্কট হলদিঘাট নামে প্রসিদ্ধ। প্রতাপ মিবারের আশা-ভরসার স্থল রাজপুতদিগের সহিত এই গিরি সঙ্কট আশ্রয় করিয়া দণ্ডায়মান হন। মোগল সৈন্য সমুপস্থিত হইলে তুমুল সংগ্রাম সংঘটিত হয়। রাজপুতগণ অসামান্য পরাক্রম-অশ্রুতপূর্ব্ব সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন; বিজয়-শ্রী মোগলের পক্ষ অবলম্বন করেন; চতুর্দ্দশ সহস্র রাজপুতের শোণিতে হলদিঘাটের ক্ষেত্র রঞ্জিত হয়, প্রতাপ জয়লাভে নিরাশ হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ করেন।

এই রূপে হলদিঘাট সমরের অবসান হয়, এই রূপে চতুর্দ্দশ সহস্র রাজপুত হলদিঘাট-রক্ষার্থ অম্লান বদনে, অসঙ্কুচিত চিত্তে আপনাদিগের জীবন উৎসর্গ করে। হলদিঘাট পরম পবিত্র যুদ্ধ-ক্ষেত্র। কবির রসময়ী কবিতায় ইহা অনন্ত কাল নিবদ্ধ থাকিবে, ঐতিহাসিকের অপক্ষপাত বর্ণনায় ইহা অনন্তকাল

ঘোষিত হইবে। প্রতাপসিংহ অনন্তকাল রাজেন্দ্র-সমাজে হৃদয়ের শ্রদ্ধার পূজা পাইবেন এবং পবিত্র হইতেও পবিত্রতর হইয়া অনন্তকাল অমর-শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট থাকিবেন।

প্রতাপ অনুচর-বিহীন হইয়া চৈতক নামে নীলবর্ণ তেজস্বী অশ্ব আরোহণে রণস্থল পরিত্যাগ করেন। এই অশ্বও তেজস্বিতায় প্রতাপের ন্যায় রাজস্থানের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। যখন দুই জন মোগল সর্দ্দার প্রতাপের পশ্চাদ্ধাবমান হয়, তখন চৈতক লম্ফ প্রদানে একটী ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য সরিৎ পার হইয়া স্বীয় প্রভুকে রক্ষা করে। কিন্তু প্রতাপের ন্যায় চৈতকও যুদ্ধ স্থলে আহত হইয়াছিল। এই আঘাতে পথি মধ্যে চৈতকের প্রাণ বিয়োগ হয়। প্রিয়তর বাহনের স্মরণার্থ প্রতাপ এই স্থলে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন। অদ্যাপি এই স্থান "চৈতকা চবুত্র" নামে প্রসিদ্ধ আছে।

১৫৭৬ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে চিরস্মরণীয় হলদিঘাট মিবারের গৌরব স্বরূপ রাজপুতগণের অনন্ত-প্রবাহ শোণিত-স্রোতে প্রক্ষালিত হয়। এদিকে সেলিম বিজয়ী হইয়া রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। কমলমীর ও উদয়পুর শত্রুর হস্তে পতিত হইল; প্রতাপ সন্তান বর্গের সহিত এক পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতে, এক অরণ্য হইতে অন্য অরণ্যে, এক গহ্বর হইতে অন্য গহ্বরে যাইয়া অনুসরণকারী মোগলদিগের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। বৎসরের পর বৎসর পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল, তথাপি প্রতাপের কষ্টের অবধি রহিল না; প্রতি নূতন বৎসর নূতন নূতন কষ্ট সঞ্চয় করিয়া প্রতাপের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। এক সময়ে বিশ্বাসী ভিলগণ প্রতাপের পরিবারবর্গকে একটী নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়া আহার দ্বারা তাহাদের প্রাণ রক্ষা করে। প্রতাপের এইরূপ অসাধারণ স্বার্থত্যাগ ও অশ্রুতপূর্ব্ব কষ্টে সদাশয় শত্রুর হৃদয়ও আর্দ্র হইল।

দিল্লীর প্রধান রাজকর্ম্মচারী ঈদৃশী হিতৈষণায় বিমোহিত হইয়া প্রতাপকে সম্বোধন পূর্ব্বক এই ভাবে একটী কবিতা লিখিয়া পাঠাইলেন, "পৃথিবীতে কিছুই স্থায়ী নহে। ভূমি ও সম্পত্তি অদৃশ্য হইবে; কিন্তু মহৎ লোকের ধর্ম্ম কখনও বিলুপ্ত হইবে না। প্রতাপ সম্পত্তি ও ভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু কখনও মস্তক অবনত করেন নাই। হিন্দুস্থানের সমুদয় রাজগণের মধ্যে তিনিই কেবল স্বীয় বংশের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন।" প্রতাপ এইরূপে বিধর্ম্মী শত্রুরও প্রশংসা-ভাজন হইয়া বনে বনে বেড়াইতে লাগিলেন। প্রাণাধিক বনিতা ও সন্তানগণের কষ্ট এক এক সময় তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। দুরন্ত মোগলগণ এ পর্য্যন্তও তাঁহার অনুসরণে ক্ষান্ত হইল না। তিনি পাঁচ বার খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করেন, কিন্তু সুবিধার অভাবে পাঁচ বারই তাহা পরিত্যাগ করিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে পলায়ন-পর হয়েন। একদা তাঁহার মহিষী ও পুত্রবধূ মাল নামক ঘাসের বীজ দ্বারা কয়েক খানি রুটী প্রস্তুত করেন এবং এই খাদ্যের একাংশ সেই সময়ের ভোজনের জন্য রাখিয়া অপরাংশ ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দেন। প্রতাপের একটী দুহিতা এই রুটি লইয়া ভোজন করিতেছিল, এমন সময়ে একটী বন্য মার্জ্জার তাহার হস্ত হইতে সেই রুটী খানি লইয়া যায়। বালিকা আর্ত্ত স্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠে; প্রতাপ অদূরে বসিয়া স্বীয় শোচনীয় অবস্থার বিষয় ভাবিতেছিলেন, দুহিতার আর্ত্ত স্বরে চমকিত হইয়া দেখেন, রুটী খানি অপহৃত হইয়াছে। প্রতাপ অম্লান বদনে হলদিঘাটে স্বদেশীয়গণের শোণিত-স্রোতঃ দেখিয়াছিলেন, অম্লান বদনে স্বদেশীয়দিগকে স্বদেশের সম্মান-রক্ষার্থ আত্ম-প্রাণ উৎসর্গ করিতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, অম্লান বদনে রাজপুত জাতি—রাজপুত বংশের গৌরব রক্ষার জন্য

রণস্থলবর্ত্তিনী করাল সংহার-মূর্ত্তির বিভীষিকায় তাচ্ছীল্য প্রদর্শন করিয়া কহিয়াছিলেন; "এই ভাবে দেহ বিসর্জ্জনের জন্যই রাজপুত্রগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে"। কিন্তু এক্ষণে তিনি স্থিরচিত্তে কন্যার কাতরতা দেখিতে সমর্থ হইলেন না। স্নেহাস্পদ বালিকাকে আর্ত্ত স্বরে কাঁদিতে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইল, যেন শত শত কাল ভুজঙ্গ আসিয়া সর্ব্বাঙ্গে দংশন করিল, প্রতাপ আর যাতনা সহিতে পারিলেন না, আপনার কষ্ট দূর করিবার জন্য আকবরের নিকট আত্ম-সমর্পণের অভিপ্রায় জানাইলেন।

প্রতাপের এই অধীনতা-স্বীকারের সংবাদে আকবর নগর-মধ্যে মহোল্লাস-সহকারে উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে আদেশ করিলেন। প্রতাপ আকবরের নিকট যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই পত্র পৃথ্বীরাজ দেখিতে পাইলেন। পৃথ্বীরাজ বিকেনিরের অধিপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। স্বজাতি-প্রিয়তা ও স্বজাতি-হিতৈষণায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল। তিনি প্রতাপকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। প্রতাপ হঠাৎ দিল্লীশ্বরের নিকট অবনত-মস্তক হইবেন, ইহা ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইল। পৃথ্বীরাজ আর কাল বিলম্ব না করিয়া নিম্নলিখিত ভাবে কয়েকটী কবিতা রচনা পূর্ব্বক প্রতাপের নিকট প্রেরণ করিলেন:—

"হিন্দুদিগের সমস্ত আশা ভরসা হিন্দুজাতির উপরই নির্ভর করিতেছে। রাণা এক্ষণে সে সকল পরিত্যাগ করিতেছেন। আমাদের সর্দ্দারগণের সে বীরত্ব নাই, নারীগণের সে সতীত্ব-গৌরব নাই। প্রতাপ না থাকিলে আকবর সকলকেই এই সমভূমিতে আনয়ন করিতেন। আমাদের জাতির বাজারে আকবর একজন দালাল; তিনি সকলই কিনিয়াছেন, কেবল উদয়ের তনয়কে কিনিতে পারেন নাই। সকলেই হতাশ্বাস

হইয়া নৌরোজার বাজারে আপনাদের অপমান দেখিয়াছেন, কেবল হামীরের বংশধরকে আজপর্য্যন্ত সে অপমান দেখিতে হয় নাই। জগৎ জিজ্ঞাসা করিতেছে, প্রতাপের অবলম্বন কোথায়? পুরুষত্ব ও তরবারিই তাঁহার অবলম্বন। তিনি এই অবলম্বন বলেই ক্ষত্রিয়ের গর্ব্ব রক্ষা করিতেছেন। বাজারের এই দালাল কিছু চির দিন জীবিত থাকিবে না, এক দিন অবশ্যই ইহলোক হইতে অবসৃত হইবে। তখন আমাদের জাতির সকলেই পরিত্যক্ত ভূমিতে রাজপুত-বীজের বপন জন্য প্রতাপের নিকট উপস্থিত হইবে। যাহাতে এই বীজ রক্ষিত হয়, যাহাতে ইহার পবিত্রতা পুনর্ব্বার সমুজ্জ্বল হইতে পারে, তাহার জন্য সকলেই প্রতাপের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।"

পৃথ্বীরাজের এই উৎসাহ-বাক্য শতসহস্র রাজপুতের তুল্য বলকারক হইল। ইহা প্রতাপের মৃতপ্রায় দেহে জীবনীশক্তি প্রদান করিল এবং তাঁহাকে পুনর্ব্বার স্বদেশের গৌরবরূপ মহৎ কার্য্য সাধনে সমুত্তেজিত করিল। প্রতাপ দিল্লীশ্বরের নিকট অবনতি স্বীকারের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু এই সময়ে বর্ষার এরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল যে, প্রতাপ কিছুতেই পর্ব্বত-কন্দরে থাকিতে পারিলেন না; মিবার পরিত্যাগ পূর্ব্বক মরুভূমি অতিবাহন করিয়া সিন্ধু নদের তটে যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সঙ্কল্প সিদ্ধির মানসে তিনি পরিবার-বর্গ ও মিবারের কতিপয় বিশ্বস্ত রাজপুতের সহিত অর্ব্বলী হইতে নামিয়া মরুপ্রান্তে উপনীত হয়েন। এই সময়ে প্রতাপের মন্ত্রী তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণের সঞ্চিত সমস্ত ধন আনিয়া প্রতাপের নিকট উপস্থিত করেন, এই সম্পত্তি এত ছিল যে, ইহা দ্বারা দ্বাদশ বর্ষকাল পঞ্চবিংশতি সহস্র ব্যক্তির ভরণপোষণ নির্ব্বাহিত হইতে পারিত। কৃতজ্ঞতার এই মহৎ দৃষ্টান্তে প্রতাপ পুনর্ব্বার সাহস

সহকারে অভীষ্ট মন্ত্র সাধনে সমুদ্যত হইলেন। অবিলম্বে অনুচরবর্গ একত্রিত হইল। প্রতাপ ইহাদিগকে লইয়া মোগল সেনা পরাজয় পূর্ব্বক কমলমিয়র পুনরধিকার ও বিলুণ্ঠন করিলেন। ইহার পর একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধেই চিতোর, আজমীর ও মণ্ডলগড় ব্যতীত সমস্ত মিবার প্রদেশ প্রতাপের পদানত হইল। কিন্তু এইরূপ বিজয়ী হইলেও প্রতাপ জীবনের শেষ অবস্থায় শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই। পর্ব্বত-শিখরে সমারূঢ় হইলেই তাঁহার নেত্র চিতোরের দুর্গ প্রাচীরের দিকে নিপতিত হইত; অমনি তিনি যাতনায় অধীর হইয়া পড়িতেন। যে চিতোরে বাপ্পা রাওর জীবিতকাল অতিবাহিত হইয়াছিল, যে চিতোরে রাজপুতকুল-গৌরব সমরশী স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার্থ দৃশদ্বতী নদীর তীরে পৃথ্বীরাজের সহিত দেহ ত্যাগ করিতে সমর-সজ্জায় সজ্জিত হইয়াছিলেন, যে চিতোরে বাদল, জয়মল ও পুত্ত সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া অম্লান বদনে—অক্ষুব্ধ হৃদয়ে অমূল্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, অদ্য সেই চিতোর শ্মশান, অদ্য সেই চিতোরের প্রাচীর অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন ভীষণ শৈলশ্রেণীর সাদৃশ্য বহন করিতেছে। প্রতাপ প্রায়ই এইরূপ চিন্তা—এইরূপ কল্পনায় অবসন্ন হইতেন, প্রায়ই তরঙ্গের পর তরঙ্গের আঘাতে তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইত।

এইরূপ অন্তর্দাহে প্রতাপ তরুণ বয়সেই ঐহিক জীবনের চরম সীমায় উপনীত হইলেন। দুরন্ত রোগ আসিয়া শীঘ্রই তাঁহার দেহ অধিকার করিল। পেশোলা হ্রদের তীরে প্রতাপ ও তাঁহার সর্দ্দারগণ বর্ষা হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই কুটীরেই প্রতাপের জীবনের শেষ অংশ অতিবাহিত হয়। প্রতাপ স্বীয় তনয় ওমরার প্রতি আস্থা-শূন্য ছিলেন। তিনি জানিতেন, কুমার ওমরা

নিরতিশয় সুখোচিত যুবক; রাজ্য রক্ষার ক্লেশ কখনই তাঁহার সহনীয় হইবে না। তনয়ের বিলাস-প্রিয়তায় প্রতাপ হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পাইয়াছিলেন; অন্তিম সময়েও এই যাতনা তাঁহা হইতে অন্তর্হিত হইল না। এই দুঃসহ মনোবেদনায় আসন্ন-মৃত্যু প্রতাপের মুখ হইতে বিকৃত স্বর সমুত্থিত হইতে লাগিল। এক জন সর্দ্দার এই কষ্ট দেখিয়া প্রতাপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার এমন কি কষ্ট হইয়াছে যে, প্রাণবায়ু শান্তভাবে বহির্গত হইতে পারিতেছে না। প্রতাপ উত্তর করিলেন, "যাহাতে স্বদেশ তুরুকের হস্তগত না হয়, তদ্বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুতি জানিবার জন্য আমার প্রাণ এখনও অতি কষ্টে বিলম্ব করিতেছে। পরিশেষে তিনি কুটীর লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "হয়ত এই কুটীরের পরিবর্ত্তে বহুমূল্য প্রাসাদ নির্ম্মিত হইবে, আমরা মিবারের যে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছি, হয়ত তাহা এই কুটীরের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইবে"। সর্দ্দারগণ প্রতাপের এই বাক্যে শপথ করিয়া কহিলেন, যে পর্য্যন্ত মিবার স্বাধীন না হইবে, সে পর্য্যন্ত কোনও প্রাসাদ নির্ম্মিত হইবে না।" প্রতাপ আশ্বস্ত হইলেন, নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইল। মিবার আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিবে শুনিয়া, তিনি শান্তভাবে ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন।

এইরূপে স্বদেশ-বৎসল প্রতাপ সিংহের পরলোক প্রাপ্তি হইল। যদি মিবারে থুকিদিদিস অথবা জেনোফন থাকিতেন, তাহা হইলে 'পেলপনিসসের সমর' অথবা 'দশ সহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন'* কখনও এই রাজপুত-শ্রেষ্ঠের অবদান অপেক্ষা ইতিহাসে

* গ্রীসের দুটি নগর স্পার্টা ও এথিনা। এথিনা পারস্যের সহিত যুদ্ধে বিশেষ গৌরবান্বিত হইলে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী স্পার্টা অসূয়াপরবশ হইয়া সমর সজ্জার আয়োজন করে। ইহাতে স্পার্টার সহিত এথিনার তিনটী

হইত যে, সমস্ত শব রাশীকৃত করিলে তাহা সমুন্নত নারিকেল বৃক্ষের অগ্রভাগ স্পর্শ করিত। স্ত্রীলোকেরা রণস্থলে তাহাদের স্বামিগণের অনুবর্ত্তিনী হইত। ইহাদের সমরবাগ্মিগণের সাধারণ নাম রাঙ্গি। রাঙ্গিগণ লতা-বিশেষ দ্বারা কটিবন্ধন করিয়া তীক্ষ্ণাস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক আপন আপন সৈন্যদিগকে নিম্নলিখিত বাক্যে উত্তেজিত করিত:—"তরঙ্গের ন্যায় প্রসারিত হও, সমুদ্র-তরঙ্গ যেমন প্রবল বেগে প্রবাল-প্রাচীর আঘাত করে, তোমরাও তেমনই বেগের সহিত বিপক্ষকে আঘাত কর, সাবধান হও; সমুদয় বল বিস্তার কর, বন্য কুক্কুটের ন্যায় তোমাদের ক্রোধ প্রদীপ্ত হউক; ভাটার জলের ন্যায় আক্রমণ পলায়ন না করিলে তোমরা প্রত্যাগত হইও না, শত্রু নাশ কর, শত্রু নাশ কর।" যুদ্ধে যাহারা বন্দী হইত, তাহারা হয় চিরদাস, নয় দেববলি হইত।

১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের সমুদ্র-পোতসকল প্রথমে এই দ্বীপে উপনীত হয়। দ্বীপবাসিগণ জাহাজ ও কামান দেখিয়া দেবতাজ্ঞানে আদর, ভয়, বিস্ময়ের সহিত ইংরেজদিগের অভ্যর্থনা করিয়াছিল। মিশনারীদের যত্নে ইহারা শিক্ষিত ও শিল্পকর্ম্মে নিপুণ হইতেছে। এক্ষণে অনেকে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং ইউরোপীয়দিগের আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিতে বিশেষ যত্নবান্ হইতেছে।

শিক্ষা ও উন্নতি।

মনুষ্য এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসারে ক্ষুদ্রতর জীব। দয়াময় জগদীশ্বর এই ক্ষুদ্রতর জীবকে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি দিয়া

মুখমণ্ডলের অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। মনুষ্য জ্ঞান ও ধর্ম্মে বিভূষিত হইলে যেমন পরম পবিত্র সুখের রসাস্বাদে সমর্থ হয়, তেমন আর কিছুতেই নহে। জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক মনুষ্য নরলোকের অদ্বিতীয় ভূষণ। তাঁহার মুখমণ্ডলে নিরবচ্ছিন্ন স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য বিরাজ করে, হৃদয় সাধুতায় পরিপূর্ণ থাকে, এবং মন ইতর-প্রাণিভোগ্য অকিঞ্চিৎকর বিষয় পরিহার পূর্ব্বক বিশুদ্ধ সুখপ্রদ উৎকৃষ্ট বিষয়ের জন্য লালায়িত হইয়া পড়ে। তরঙ্গিণী যেমন আপনার বারি-রাশি চারিদিকে বিস্তার করিয়া ভূভাগ ফলপুষ্পে সুশোভিত করে, বিদ্যালোকসম্পন্ন ও ধর্ম্মপরায়ণ মানবও তেমনই আপনার জ্ঞান ও ধর্ম্মবলে সাধারণের হৃদয় বিবিধ গুণ-গ্রামে ভূষিত করিয়া থাকেন। বিদ্যাসম্পন্নেরা সতত উন্নত থাকিয়া উচ্চতর বিষয়ের দিকে প্রধাবিত হন। বিদ্যাহীনের চিত্ত-প্রাসাদ ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকে, বিদ্বানের অন্তঃকরণ চন্দ্রালোক-দীপ্ত পৌর্ণমাসী রজনীর ন্যায় সর্ব্বদা উজ্জ্বল থাকিয়া অনির্ব্বচনীয় প্রীতির উৎপত্তি করে। লোকে বিদ্যার প্রসাদে অতি সামান্য অবস্থা হইতে সংসারে উন্নত অবস্থাপন্ন ও সৌভাগ্যশালী হইয়াছেন। সুবিদ্বান্ ও সুশিক্ষিত হইতে হইলে স্বাবলম্বন থাকা আবশ্যক। যাহার স্বাবলম্বন নাই, সে কোন বিষয়েই উন্নতি লাভ করিতে পারে না। আত্মনির্ভরের ভাব মনুষ্যকে সর্ব্বদা কষ্ট-সহিষ্ণু ও পরিশ্রমশীল করে। কষ্টসহন ও পরিশ্রমবলে লোকে দুঃসাধ্য কার্য্য সাধন করিয়া উন্নতি লাভে সমর্থ হয়। অধিকন্তু আত্মাবলম্বন থাকিলে আত্মাদর জন্মে। আপনার প্রতি আদর ও আস্থা না থাকিলে মনুষ্য স্বকর্ত্তব্য সাধনে সর্ব্বদা ঔদাসীন্য অবলম্বন করে। পরমুখপ্রেক্ষী মানবগণের কষ্টের ইয়ত্তা থাকে না। তাহাদের শিক্ষা প্রগাঢ় হয় না, কর্ত্তব্যবুদ্ধি বলবতী থাকে না, এবং মনোবৃত্তি তেজস্বিনী হয় না।

শান্তি করিত, মনোহর উদ্যানে পরিভ্রমণ করিত এবং নানা জাতি বিহঙ্গমের সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া সুখিত হইত। কে তাহাদের সম্মুখে এই সকল উপভোগ-সামগ্রী প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন, কাহার করুণাবলে তাহারা এই রূপ অনির্ব্বচনীয় সুখের অধিকারী হইয়াছে, তাহা একবারও ভাবিত না। আহার, নিদ্রা প্রভৃতি সামান্য পশুবৃত্তি চরিতার্থ করাই তাহাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তাহারা কটিদেশে একখণ্ড বল্কল পরিধান ও হস্তে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া মৃগয়া-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত। একণে মিশনারিদের যত্নে তাহাদের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইয়াছে। তাহারা একণে আবাস-দ্বীপের সমস্ত পদার্থই নূতন চক্ষে দর্শন করিতেছে এবং জ্ঞান ও সভ্যতায় পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে উন্নত হইয়া পবিত্র মানব জাতির জীবন সাধনে অগ্রসর হইতেছে।

পলিনেশিয়ার অধিবাসিগণের দেহ প্রত্যঙ্গের গঠন অতি সুন্দর। ইহারা অতি দীর্ঘ বা অতি খর্ব্বাকার নহে। ইহারা অতিশয় কর্ম্মক্ষম। ইহারা কহে, ইউরোপীয়দিগের আগমনের পূর্ব্বে তথায় কদাকার বা খঞ্জ ব্যক্তি ছিল না। ইহাদের ললাট প্রশস্ত, নেত্র দীর্ঘ, উজ্জ্বল ও কৃষ্ণবর্ণ; নাসিকা তিলফুল সদৃশ; ওষ্ঠ মাংসল; দন্ত শুভ্র এবং কর্ণ দীর্ঘ। ইহাদের কেশ অতি কোমল ও কুঞ্চিত, দেহ পিঙ্গলবর্ণ। ইহাদের অবলাগণ অতিশয় বলিষ্ঠ। তাহারা পুরুষের অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বটে, কিন্তু আমাদের দেশের নারীগণ অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ। ইহাদের সর্দ্দারেরা সাধারণ লোক অপেক্ষা অধিকতর দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ। ইহাদের মতে কৃষ্ণ বর্ণ বলের লক্ষণ। ইহারা কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দেখিলেও বলিয়া উঠে, "আহা! উহার অস্থি সকল কেমন দৃঢ়, ঐ সকল অস্থিতে কেমন সুন্দর বঁড়শি ও হাতুড়ি হইতে পারে"।

ইহারা ধীর-প্রকৃতি, প্রশস্ত-হৃদয় ও আতিথেয়। ইহারা অধিক পরিশ্রম করে না এবং অধিক ভোজনও করে না। ইহারা শীঘ্র শীঘ্র নিদ্রাভিভূত হয় এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করে। ইহাদের মনোবৃত্তি যতদূর পরিমার্জ্জিত হওয়া উচিত, আজপর্য্যন্ত ততদূর হইয়া উঠে নাই। অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জের লোক অপেক্ষা সোসাইটী দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিদিগকে অধিক বুদ্ধিমান্ বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের যেমন রীতি নীতি ও আচার ব্যবহার, ইহারা আপনাদের সমাজে যেমন বাগ্মিতা প্রকাশ করে, এবং ইহাদের যেমন ভাষাগত সৌন্দর্য্য, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হয় যে, ইহাদের মানসিক বৃত্তি সবিশেষ তেজস্বিনী ও উন্নত গুণ-বিশিষ্টা। দ্বীপবাসিগণ অঙ্ক শাস্ত্রে বিলক্ষণ তৎপর। ইহাদের অনেকে বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া এক প্রকারে বাইবেলের অর্থ করিতে শিখিয়াছে।

দ্বীপবাসিদিগের সংখ্যা অধিক নহে। সমুদয় দ্বীপে পঞ্চাশৎ সহস্রের অধিক অধিবাসী হইবেনা। পূর্ব্বে লোক সংখ্যা অধিক ছিল। কিন্তু যুদ্ধ, নরহত্যা, ভ্রূণ-হত্যা ও নরবলি দ্বারা অনেক লোক নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে ইহারা প্রায়ই পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিত। লাঠী, বড়শা, ধনু, তীর, ইহাদের যুদ্ধাস্ত্র। প্রতি যুদ্ধেই রুধির-স্রোত প্রবাহিত হইত। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে ইহারা 'ওরো' দেবের নিকট নরবলি দিয়া একাগ্রচিত্তে জয় প্রার্থনা করিত। তাহার পর যুদ্ধতরী সকল সংগৃহীত ও সুসজ্জিত হইত, যুদ্ধাস্ত্র সকল সম্মার্জ্জিত হইত, এবং দলস্থ লোকদিগকে একত্র করিবার জন্য চারিদিকে দূত প্রেরিত হইত। পুরোহিতেরা অনুগ্রহ-লাভের আশায় বিবিধ উপচারে দেবতাদের পূজা করিত। বহুসংখ্য সৈন্য একত্রিত হইলে যুদ্ধ আরম্ভ হইত। যুদ্ধক্ষেত্রে এত লোক নিহত

বারি-রাশি ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টি-গোচর হইত না, সেখানে এক্ষণ শত শত দ্বীপ ফল-পুষ্প-সুশোভিত ও তরুরাজি-সমাকীর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে।

করুণাময় পরমেশ্বর আপনার অনন্ত করুণাবলে সাগরের উপদ্রব হইতে এই সকল দ্বীপ রক্ষা করিবার উপায় বিধান করিয়াছেন। পলিনেসিয়ার অপেক্ষাকৃত বৃহৎ দ্বীপ গুলির অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে প্রবাল কীট-নির্ম্মিত এক একটী চক্রাকার প্রাচীর আছে। এই সকল প্রাচীর বর্ত্তমান থাকাতে দ্বীপ সমূহে ঊর্ম্মিরাশির আঘাত লাগিতে পারে না। পর্ব্বতাকার সমুন্নত সমুদ্র-তরঙ্গ প্রাচীরে আহত হইয়াই প্রতিনিবৃত্ত হয়। উক্ত প্রাচীর সমূহের স্থান বিশেষে এক একটী দ্বার আছে, এই দ্বার দিয়া অর্ণব-পোত সকল দ্বীপ-প্রান্তে উপনীত হইয়া থাকে।

পলিনেসিয়ার দ্বীপ সমূহ মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিভূষিত। সমুদ্র হইতে এই সকল দ্বীপ অতি রমণীয় দেখায়। কোথায় হরিদ্বর্ণ তরু-শাখা ও লতা সমূদয় সুশোভন ফল-পুষ্পে অলঙ্কৃত হইয়া বারিধি-হৃদয়ে আন্দোলিত হইতেছে, কোন স্থানে পুরোবর্ত্তী নারিকেল প্রকাণ্ড বৃক্ষের নিম্নভাগে দ্বীপবাসিদের পরিষ্কৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর সকল শোভা বিকাশ করিতেছে, অদূরবর্ত্তী উপত্যকা-ভাগে শ্যামল শস্য-রাশি মন্দ মন্দ পবন ভরে সঞ্চালিত হইতেছে, স্থানান্তরে বেগবতী তরঙ্গিণী ঘোররবে পর্ব্বত-কন্দর হইতে নির্গত হইয়া, উর্ব্বরক্ষেত্র সমুদয় পরিবেষ্টন পূর্ব্বক মহাসাগরে সম্মিলিত হইতেছে; স্থল-বিশেষে মেঘমালা সদৃশ পর্ব্বতশ্রেণী জলধি-গর্ভ হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া ভীষণভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সাগর-তল হইতে এই সকল দর্শন করিলে আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না। ফলে পলিনেসিয়ার দ্বীপ সকল প্রকৃতির ক্রীড়া-কানন বলিয়া বোধ হয়। দ্বীপস্থিত সমস্ত পদার্থই উৎকৃষ্ট বেশ

বর্ষণ করিয়া সর্ব্বত্র শান্তি বিস্তার করে। এই স্থানে পদার্পণ করিলে হৃদয় অনির্ব্বচনীয় ও অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব আনন্দরসে প্লাবিত হইয়া থাকে।

এই সকল দ্বীপের ভূমি যেমন উর্ব্বর, জল বায়ুও তেমন স্বাস্থ্য-কর। এখানে অনেক প্রকার ফল ও মূল পাওয়া যায়। ব্রেড-ফ্রুট নামে কাঁঠালের ন্যায় এক প্রকার ফল আছে। ব্রেডফ্রুটের বৃক্ষ দীর্ঘাকার ও বহুস্থান-ব্যাপী। ইহার পত্রগুলি দন্তুর ও ষোল, সতর ইঞ্চ লম্বা। বৎসরে এই বৃক্ষের তিন চারিবার ফল হয়। ফল সকল পক্ক হইলে পীতবর্ণ হইয়া থাকে। এই ফল এখানকার অধিবাসিদিগের প্রধান ভক্ষ্য দ্রব্য। ব্রেডফ্রুটের বৃক্ষের তক্তায় গৃহ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরী নির্ম্মিত হয়, এবং বল্কলে দ্বীপ-বাসিদের বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত এখানে সুস্বাদু জাম্বু, এরারুট, নারিকেল, কদলী ও ইক্ষু প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই স্থানের ইক্ষুরসের ন্যায় সুস্বাদু ইক্ষুরস কোথাও পাওয়া যায় না। ইক্ষু হইতে কি প্রকারে চিনি প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা পূর্ব্বে পলিনেসিয়া-বাসিগণ অবগত ছিল না। পরি-শেষে মিশনারিগণ এখানে আসিয়া ইহাদিগকে এই বিষয় শিখাইয়াছেন। পূর্ব্বে আঙ্গুর, কমলালেবু, তেঁতুল প্রভৃতি এই সকল দ্বীপে জন্মিত না; মিশনারিদের যত্নে এক্ষণে তৎসমুদয় প্রচুর পরিমাণে জন্মিতেছে।

পলিনেসিয়ায় সকল প্রকার ভোগ্য দ্রব্য রাশীকৃত হইয়া রহিয়াছে। যখন যে বস্তুতে অভিলাষ জন্মে, প্রকৃতির অনু-কূলতা বশতঃ তাহাই পাওয়া গিয়া থাকে। পূর্ব্বে কেবল পশু-প্রকৃতিক অসভ্য মনুষ্যগণ এই নন্দন কানন উপভোগ করিত। তাহারা বৃক্ষের অনায়াস-লব্ধ মধুময় ফল ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইত, সুশীতল ও সুপরিষ্কৃত বারি পান করিয়া তৃষ্ণা

তাঁহারা সকল বিষয়েই পরের মুখের দিকে চাহিয়া মানব নাম কলঙ্কিত করে।

যাঁহারা সংসারে উন্নত অবস্থার অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বিদ্যা, ধর্ম্ম ও স্বাবলম্বন শিক্ষা করিয়াছিলেন। পুরাবৃত্ত পাঠে অবগত হওয়া যায়, দরিদ্রের গৃহ হইতেই অধিকাংশ মনস্বী ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই স্বাবলম্বন-বলে সুশিক্ষা পাইয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন। আত্মাবলম্বন, বিদ্যা ও ধর্ম্ম শিক্ষা না হইলে উন্নতি হয় না।

যখন প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন, তখন আমাদের দেশে একজন দীন বৈদিক ব্রাহ্মণের গৃহে একটী বালক জন্ম গ্রহণ করে। উক্ত বালকের নাম গোবিন্দ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী*। মানুষ স্বাবলম্বন ও বিদ্যা-বলে কিরূপ উন্নত-অবস্থাপন্ন হয়, তাহা এই গোবিন্দ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর জীবন বৃত্তান্ত পাঠে সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়। নবদ্বীপের অগ্নিকোণে মুক্তাবখুলি নামক স্থানে গোবিন্দ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর জন্ম হয়। এই সময়ে নবাব সায়েস্তা খাঁর হস্তে বাঙ্গালার শাসন-ভার ছিল। গোবিন্দের পিতা নিরতিশয় দরিদ্র ছিলেন, অতি কষ্টে স্ত্রী ও পুত্রটী লইয়া সংসার নির্ব্বাহ করিতেন। একদা গোবিন্দ সমবয়স্ক একটী বালকের মুখে 'লাউ চিঙ্গড়ির' বিবরণ শুনিয়া, তাহা খাইতে মাতার নিকট অভিলাষ প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁহার মাতা দারিদ্র্যবশতঃ মৎস্য ক্রয় করিতে অসমর্থ হইলেন। গোবিন্দ ছাড়িবার পাত্র নহেন, 'লাউ চিঙ্গড়ি' খাইবার জন্য বিলক্ষণ আবদার আরম্ভ করিলেন। এমন সময়ে একজন মৎস্যবিক্রয়িণী

---

* গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী আমাদের দেশে মুকুট রায় নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু মুকুট রায় প্রকৃতপক্ষে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর নিজের নাম নহে। উহা তাঁহার পুত্রের নাম।

তথায় উপস্থিত হইল। গোবিন্দের জননী বাজারে লাউ কিনিয়া, পুত্রের জন্য 'লাউ চিঙ্গড়ি' রাঁধিতে প্রস্তুত হইলেন।

মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল। মৎস্য-বিক্রয়িণী পাড়ায় পাড়ায় মৎস্য বিক্রয় করিয়া, গোবিন্দের মাতার নিকট আসিয়া, বিক্রীত মৎস্যের মূল্য চাহিল। গোবিন্দের মাতা তখন মূল্য দিতে অসমর্থ হইলেন। মৎস্য-জীবিণী ইহাতে গোবিন্দের জননীকে লক্ষ্য করিয়া নানাপ্রকার কটূতর গালি দিল। গোবিন্দের পিতা এই ব্যাপার অবগত হইয়া বিলক্ষণ বিরক্ত হইলেন, এবং পুত্রের জন্য ছোট লোকের গালি খাইতে হইল বলিয়া উদ্দেশে পুত্রকে অনেক তিরস্কার করিলেন। এই ঘটনায় গোবিন্দের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। গোবিন্দ ভোজন হইতে বিরত হইয়া অর্থোপার্জ্জন মানসে গৃহ-বহির্গত হইলেন। এই সময়ে গোবিন্দের বয়স আট বৎসর।

গোবিন্দ সেই প্রখর মধ্যাহ্ন-সময়ে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, ভাগীরথীর তীরে একটী তাল বৃক্ষে পক্ষীর কুলায় নিরীক্ষণ করিলেন। পক্ষী-শাবক গ্রহণে লোলুপ হইয়া গোবিন্দ সেই বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক বাসায় যেমন হস্ত প্রসারণে উদ্যত হইয়াছেন, অমনি একটী সর্প তাহা হইতে অর্দ্ধ-নিষ্ক্রান্ত হইয়া দংশনে উন্মুখ হইল। অষ্টবর্ষীয় বালক উপস্থিত-বুদ্ধি-বলে বিষধরের গলা এমন বলের সহিত টিপিয়া ধরিলেন যে, সে আর দংশন করিতে পারিল না। সর্প দংশনে অক্ষম হইল বটে, কিন্তু লাঙ্গুল দ্বারা গোবিন্দের হস্ত দৃঢ়রূপে জড়াইয়া ধরিল। গোবিন্দ এই রূপ বিপন্ন অবস্থায় কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন না, অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলে অপর হস্ত দ্বারা লাঙ্গুলের অগ্রভাগ ধরিয়া এক এক বেড় খুলিতে লাগিলেন, এবং তাহা তালীয় পত্রা (তালের বাগুড়া) দ্বারা ছিন্ন করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

অধিকতর মধুর ভাবে কীর্ত্তিত হইত না। অনমনীয় বীরত্ব, অবিচলিত দৃঢ়তা, অশ্রুতপূর্ব্ব অধ্যবসায় সহকারে প্রতাপ দীর্ঘকাল প্রবল-পরাক্রান্ত, উন্নতাকাঙ্ক্ষ, সহায়-সম্পন্ন সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। এজন্য আজপর্য্যন্ত প্রতাপ সিংহ প্রত্যেক রাজপুতের হৃদয়ে অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। যত দিন স্বদেশ-হিতৈষণা রাজপুতের মনে অঙ্কিত থাকিবে, তত দিন প্রতাপ সিংহের এই দেবভাবের ব্যত্যয় হইবে না।

প্রতাপ সিংহ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দুরন্ত যবন হইতে মাতৃভূমির উদ্ধারার্থে যে সমস্ত মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, রাজস্থানের ইতিহাসে তাহা চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। শতাব্দের পর শতাব্দ অতীত হইয়াছে, অদ্যাপি রাজস্থানের লোকের স্মৃতিতে এই বৃত্তান্ত জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। পূর্ব্বপুরুষের এই বৃত্তান্ত বলিবার সময় রাজপুতের হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব তেজের আবির্ভাব হয়, ধমনী মধ্যে রক্তের গতি প্রবল হয়, এবং নয়ন-জলে গণ্ডদেশ প্লাবিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ প্রতাপ সিংহের কার্য্য-পরম্পরা রাজস্থানের অদ্বিতীয় গৌরব ও অদ্বিতীয় মহত্ত্বের বিষয়। কোন ব্যক্তি বা দেশের জন্য গ্রহণ

[illegible] হয়। "[illegible]" বলিয়া বিখ্যাত। প্রসিদ্ধ [illegible] বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

পারস্যের রাজা দরায়ুস লোকান্তরগত হইলে তাহার পুত্র অর্তক্ষত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু অর্তক্ষত্রের ভ্রাতা সাইরস রাজ্য প্রাপ্তির জন্য দশ সহস্র গ্রীক সৈন্যের সাহায্যে সমরে প্রবৃত্ত হয়েন। খ্রীঃ পূঃ ৪০১ অব্দে সাইরস সমরে নিহত হইলে গ্রীক সেনাপতি জেনোফন তাহার দশ সহস্র সৈন্যের সহিত বিশিষ্ট পরাক্রম ও কৌশল সহকারে স্বদেশে প্রত্যাগত হয়েন। ইহাই "দশ সহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন" বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। গ্রীক সেনাপতি ও ইতিহাসলেখক জেনোফন ইহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লিখিয়াছেন।

করিয়া ও সর্ব্ব প্রকার সৌভাগ্য-সম্পত্তির অধিকারী হইয়া, প্রতাপের ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন হয়েন নাই, কোনও ব্যক্তি স্বদেশ হিতৈষণায় উদ্দীপ্ত হইয়া স্বাধীনতা রক্ষার্থ বনে বনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইয়া, প্রতাপের ন্যায় কষ্টভোগ করেন নাই। অর্ব্বলী পর্ব্বত-মালার সমস্ত দরী, সমস্ত উপত্যকাই প্রতাপ সিংহের গৌরবে উদ্ভাসিত রহিয়াছে। চিরকাল এই গৌরব-স্তম্ভ উন্নত থাকিয়া রাজস্থানের মহিমা প্রকাশ করিবে। ভারত মহাসাগরের সমগ্র বারিতেও ইহা নিমগ্ন হইবে না, হিমালয়ের সমগ্র অভ্রংলিহ শৃঙ্গপাতেও ইহা বিচূর্ণ হইবে না।

পলিনেসিয়ার বিবরণ।

প্রশান্ত মহাসাগরে যে সকল দ্বীপ-পুঞ্জ লক্ষিত হয়, তাহার সাধারণ নাম পলিনেসিয়া। অল্পদিন হইল এই সকল দ্বীপের বিবরণ সাধারণের পরিজ্ঞাত হইয়াছে। পলিনেসিয়া দ্বীপ সমূহের উৎপত্তি-বিবরণ অতি অদ্ভুত। বিশ্বপাতা জগদীশ্বরের অসীম শক্তি-বলে কত স্থানে যে কত বিস্ময়কর ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অতি সামান্য পদার্থও ঈশ্বরের মহিমা-প্রসাদে দুরূহ কার্য্য সাধন করিয়া সাধারণকে চমৎকৃত করিয়া তুলিতেছে। পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, সমুদ্র-গর্ভস্থ প্রবাল কীট সকল পলিনেসিয়ার অধিকাংশ দ্বীপ নির্ম্মাণ করিয়াছে। কিরূপে এমন ক্ষুদ্র কীট দ্বারা এমন মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন হইল, তাহা মানব-বুদ্ধির অগম্য। এই সমস্ত প্রবাল কীট প্রশান্ত মহাসাগর একবারে রূপান্তরিত করিয়া তুলিয়াছে। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেখানে অনন্ত-বিস্তৃত সুনীল

এই সময়ে এক জন সন্ন্যাসী যদৃচ্ছাক্রমে সেই তাল বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি বৃক্ষারূঢ় বালকের অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতি ও সাহস দেখিয়া তাহাকে সঙ্গী করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে গোবিন্দ বিষধরকে বিনষ্ট করিয়া, বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিলে সন্ন্যাসী তাহাকে পক্ষিশাবক দিবার লোভ দেখাইয়া সঙ্গে লইলেন, এবং অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন।

গোবিন্দ দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া অসাধারণ অধ্যবসায় ও স্বাবলম্বন বলে অল্প সময়ের মধ্যেই আরবী ও পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত হইলেন। তিনি আরবীর সুললিত কবিতাবলী আবৃত্তি করিতে করিতে দিল্লীর রাজপথ দিয়া গমন করিতেন। সম্রাটের প্রধান অমাত্য এক দিবস অবগত হইয়া গোবিন্দকে নিকটে আহ্বান করেন। গোবিন্দ উপস্থিত হইলে দেওয়ান তাঁহার গঠন-সৌন্দর্য্য ও মুখ-শ্রীতে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ দেখিয়া তাঁহাকে বিষয়-কার্য্য শিক্ষা দেন। গোবিন্দ প্রধান অমাত্যের অনুগ্রহে অনেক কার্য্যে নিয়োজিত হয়েন। সমুদয় কার্য্যেই তাঁহার বিলক্ষণ পারদর্শিতা লক্ষিত হয়। দিল্লীর তৎকালীন সম্রাট্ গোবিন্দের কার্য্য-নৈপুণ্যের বিষয় অবগত হইয়া পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার প্রধান রাজস্ব-সচিবের পদ সমর্পণ করেন। গোবিন্দ এই রূপে বিদ্যা, বুদ্ধি ও স্বাবলম্বন বলে প্রধান পদে আরূঢ় হয়েন, এবং ধর্ম্ম পথে থাকিয়া বিপুল অর্থ উপার্জ্জন পূর্ব্বক অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন।

আমাদের দেশের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের জীবন-বৃত্তও রাজস্বসচিব গোবিন্দ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর জীবনীর ন্যায় অসাধারণ উন্নতি-জনক ঘটনায় পরিপূর্ণ। অলোক-সামান্য বিদ্যা ও বুদ্ধি বলে জগন্নাথ আপনার অবস্থা বিলক্ষণ উন্নত করিয়া-

ছিলেন। গোবিন্দ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ন্যায় জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননও দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান। ইনি ত্রিবেণী গ্রামে ১১০২ সালে (খ্রীঃ ১৬৯৫ অব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রুদ্রদেব তর্কবাগীশ। সংস্কৃত শাস্ত্রে রুদ্রদেবের বিশিষ্ট অধিকার ছিল। তিনি সংস্কৃতে কয়েক খানি গ্রন্থ রচনা করেন। জগন্নাথের যখন জন্ম হয়, তখন রুদ্রদেবের বয়স ছয়ষট্টি বৎসর হইয়াছিল।

রুদ্রদেব তর্কবাগীশ অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। ক্রিয়া-কাণ্ডের নিমন্ত্রণ ও শিষ্য যজমান হইতে যাহা লাভ হইত, তাহা দ্বারা কষ্টে ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিতেন। জগন্নাথের বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন রুদ্রদেব তাঁহাকে বিদ্যা শিক্ষায় প্রবর্ত্তিত করেন। জগন্নাথ অসাধারণ স্মৃতি-শক্তি বলে পিতার নিকট মুখে মুখে ব্যাকরণ ও অভিধান শিখিয়া কয়েকখানি সাহিত্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। তাঁহার স্বাবলম্বন-শক্তি এতদূর বলবতী ছিল যে, পূর্ব্বে যাহা না পড়া হইয়াছে, তাহাও পঠিত পাঠের ন্যায় আবৃত্তি করিতে পারিতেন। জগন্নাথ পিতার নিকট ব্যাকরণ প্রভৃতি সমাপ্ত করিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভবদেব ন্যায়ালঙ্কারের বংশবাটী (বাঁশ-বেড়িয়া) স্থিত চতুষ্পাঠীতে স্মৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। যখন তাঁহার বয়স দ্বাদশ বর্ষ তখন তিনি স্মৃতিশাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন। স্মৃতির পর জগন্নাথ ন্যায় শাস্ত্র অভ্যাস করিয়া তাহাতেও বিশিষ্ট পারদর্শিতা লাভ করেন।

চব্বিশ বৎসর বয়সে জগন্নাথের পিতৃ-বিয়োগ হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, রুদ্রদেব নিরতিশয় দরিদ্র ছিলেন। তাঁহার কিছুরই সংস্থান ছিল না। জগন্নাথ সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া পিতার প্রেত-কৃত্য সম্পন্ন করিলেন। এই রূপে সর্ব্বস্বান্ত হওয়াতে জগন্নাথের কষ্টের অবধি রহিলনা। তিনি অপরের নিকট গৃহকর্ম্মোপযোগী দ্রব্যাদি চাহিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। এই রূপ দুঃ-

দান করিয়াছেন, তিনি তৎসমুদায়ের যথাযোগ্য ব্যবহারে সমর্থ হইতে পারেন। তিনি তাঁহার জীবন সর্ব্বোৎকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে পারেন এবং সত্যবাদী, সাধুশীল, বিশ্বাসী ও সুব্যবস্থিত হইতে পারেন। সংক্ষেপে ঐশীশক্তি তাঁহাকে যে অবস্থায় স্থাপিত করিয়াছে, তিনি সেই অবস্থায় থাকিয়াই স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন।"

কেবল জ্ঞানানুশীলনের সহিত চরিত্রের পবিত্রতার তাদৃশ নিকটতম সম্বন্ধ নাই। তাই বলিয়া বিদ্যা [illegible] অবহেলার [illegible] বিষয় নহে। বিদ্যার সহিত সাধুতার সংযোগ থাকা [illegible] কোন কোন সময়ে বিদ্যার সহিত অসাধুতা ও নিকৃষ্টতার [illegible] সম্মিলন দৃষ্ট হয়। এক ব্যক্তি সাহিত্য, দর্শন ও শিল্পে সুপণ্ডিত হইতে পারেন কিন্তু সাধুতা, ধর্ম্মশীলতা, সত্যবাদিতা ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠায় তিনি নিরক্ষর ও দরিদ্র কৃষকগণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়া থাকেন। কোন সুপণ্ডিত ও সুলেখক বলেন, "আমি অনেক পুস্তক পাঠ করিয়াছি, অনেক [illegible] করিয়াছি, অনেক প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তির সহিত [illegible] করিয়াছি; কিন্তু অশিক্ষিত পুরুষ ও রমণীগণ [illegible] যে সকল মত ব্যক্ত করিয়াছে, তাহা পুস্তকাদির মত অপেক্ষাও উচ্চতর। আমরা যাবৎ সমুদয় পদার্থই চন্দ্রালোকের ন্যায় নির্ম্মল ও অনবদ্য দেখিতে অভ্যাস না করিব, তাবৎ জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করিতে সমর্থ হইব না"।

বিদ্যা অপেক্ষা ধনের সহিত চরিত্রোন্নতির আরও দূরতর সম্বন্ধ। ধন অনেক সময়ে চরিত্র দূষিত ও অপকৃষ্ট করিয়া থাকে। অর্থ, ভোগাসক্তি, অপকর্ষ ও পাপ পরস্পর ঘনিষ্ঠতায় আবদ্ধ। অপরিমিত [illegible] আত্মশাসনাক্ষম ও ইন্দ্রিয়-পর ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হয়, তাহা হইলে উহা নানা অনর্থের মূল হইয়া উঠে। পক্ষা-

ন্তরে দরিদ্রাবস্থার সহিত চরিত্রের অপেক্ষাকৃত নিকট সম্বন্ধ আছে। লোকে নিজের পরিশ্রম, মিতব্যয়িতা ও সদাচারের উপর নির্ভর করিয়া চলিলে মনুষ্যত্বের উচ্চতর শ্রেণীতে আরোহণ করিতে সক্ষম হয়। একজন জ্ঞানী তাঁহার পুত্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন:—"যদিও তোমার একটা কপর্দ্দক সম্বল নাই, তথাপি মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে বিমুখ হইও না; যে হেতু, হৃদয় সাধু ও মনুষ্যোচিত না হইলে কেহই সম্মানিত হয় না।" এক ব্যক্তি সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া আপনার পরিবারের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি যদিও বিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন নাই, তথাপি বিলক্ষণ জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ছিলেন। তাঁহার পুস্তকালয়ে একখানি ধর্ম্মপুস্তক ও কয়েক খানি সাহিত্য ব্যতীত আর কিছুই ছিলনা। তাঁহার আয়ও যৎসামান্য ছিল। এই সামান্য ব্যক্তি কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সৎপ্রকৃতি ও সদ্ব্যবহারের বলে এরূপ খ্যাতি রাখিয়া গিয়াছেন যে, তাহা অনেক ধনবান্ ও মহৎ ব্যক্তির ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই।

চেষ্টা ব্যতিরেকে চরিত্র উন্নত ও উচ্চভাবে পূর্ণ হয় না। চরিত্রের উন্নতির জন্য, আত্মপর্য্যবেক্ষণ, আত্মশৃঙ্খলা ও আত্মশাসন থাকা বিশেষ আবশ্যক। পৃথিবীর চারিদিকেই পাপ বিকট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছে, চারি দিকেই প্রলোভন-সামগ্রী বিস্তৃত আছে, এই পাপ ও প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চরিত্র উন্নত করিতে হইলে আত্মপর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতির আবশ্যকতা অনুভূত হয়। যাহা পাপ-জনক ও যাহা অকর্ত্তব্য, তাহা চিরকাল ঘৃণার সহিতই পরিত্যাগ করা বিধেয়। আত্মপর্য্যবেক্ষণ ও আত্মশৃঙ্খলা না থাকিলে পাপ হইতে দূরে থাকিয়া সৎ পথ অবলম্বন করা যায় না। আত্মশাসন সকল কর্ম্মের মূল; আত্মশাসন-ক্ষমতা না থাকিলে মনুষ্য প্রায়ই কুপথে পদার্পণ করিয়া চরিত্র দূষিত করে।

যখন কোন অকার্য্যের অনুষ্ঠানে ইচ্ছা জন্মে, তখন আত্মশাসন-বলে সেই ইচ্ছা সংযত করা কর্ত্তব্য। বাল্যশিক্ষা ও সংসর্গের উপর চরিত্রের উন্নতি ও অবনতি অনেকাংশে নির্ভর করে। আত্মশাসন দ্বারা আপনাকে অসৎ বিষয়-শিক্ষা ও অসৎ সংসর্গ হইতে বিরত রাখা বিধেয়।

আত্মপর্য্যবেক্ষণ, আত্মশৃঙ্খলা ও আত্মশাসনের সহিত সুশিক্ষা ও সদ্দৃষ্টান্তের সংযোগ থাকা উচিত। সুশিক্ষায় অন্তঃকরণ মার্জ্জিত হয়, হৃদয় প্রশস্ত হয়, এবং কর্ত্তব্য-জ্ঞান অটল হইয়া থাকে। এই রূপে সদ্দৃষ্টান্তে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে বলবতী ইচ্ছা জন্মে। চরিত্র ক্রমে এই সুশিক্ষা, সদ্দৃষ্টান্ত ও আত্মপর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতিতে উন্নত, ব্যবস্থিত ও পবিত্র হইয়া উঠে।

উন্নত চরিত্রের লোক সমাজের অলঙ্কার স্বরূপ। অনেকে কেবল চরিত্রের গুণেই সামান্য অবস্থা হইতে ধনে ও সম্মানে প্রতি-ষ্ঠার লোক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। আমাদের দেশের সর্ব্ব-প্রধান ধনী রামদুলাল দেবের জীবন-বৃত্ত ইতিহাসের বর্ণনীয় বিষয় হইয়া রহিয়াছে। রামদুলাল কেবল চরিত্রের গুণে মাসিক দশ টাকা বেতনের সামান্য সরকারী হইতে কোটীপতি হইয়া ছিলেন। দমদমার সমীপবর্ত্তী রেকুজানি নামক এক খানি ক্ষুদ্র গ্রামে রাম-দুলালের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম বলরাম সরকার। বল-রাম নিরতিশয় দরিদ্র ছিলেন। খড় বিক্রয় ও সামান্য গুরু মহাশয়গিরি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। শৈশব কালেই রামদুলাল পিতৃ-মাতৃ-হীন হয়েন। এজন্য তাঁহার ভরণপোষণের ভার মাতামহের উপর পড়ে। রাম দুলালের মাতামহের আবাস কলিকাতায় ছিল। এই সময়ে রাম দুলালের মাতামহী কলিকাতা-নিবাসী মদন মোহন দত্তের অন্তঃপুরে পাচিকার কর্ম্ম করিতেন। ক্রমে রামদুলাল মদন মোহনের পরিবারমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সং-

সামান্য লেখা পড়া শিক্ষা করেন। মদনমোহন সে সময়ে ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। রামদুলাল ষোল বৎসর বয়সে মদন মোহন দত্তের অনুগ্রহে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে বিল্‌-সরকার হয়েন। এই সামান্য কর্ম্ম করিয়া তিনি বৃদ্ধ মাতামহের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিতেন। রামদুলালের সৎস্বভাব ও কার্য্য-নৈপুণ্য দেখিয়া মদন মোহন তাহাকে দশ টাকা বেতনের সরকারী পদ অর্পণ করেন। ইহাতে রামদুলালকে প্রতিদিন জাহাজে গিয়া বাণিজ্য দ্রব্যাদি দেখিতে হইত। এক দিন রামদুলাল কার্য্য করিতে গিয়া ভাগীরথীতে এক খানি জাহাজ জলমগ্ন দেখিতে পান। এই জাহাজ দেখিয়াই তিনি উহাতে কি পরিমাণে দ্রব্য আছে, এবং উহার মূল্য কত হইবে, নিরূপণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার কিছু দিন পরে মদন মোহন দত্ত একটী নির্দ্দিষ্ট নীলাম ক্রয় করিতে রাম দুলালকে কোন আফিসে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু রামদুলালের যাইবার পূর্ব্বেই সেই নীলাম বিক্রীত হইয়া যায়। রামদুলাল যাইয়া শুনিলেন, এক খানি জাহাজ নীলামে বদ্ধ হইয়াছে। ইহাই যে তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট জাহাজ, তাহা রামদুলালের স্পষ্ট অনুমিত হইল। সুতরাং রাম দুলাল মদন মোহনের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই ১৪,০০০ টাকা দিয়া ঐ জাহাজ ক্রয় করিলেন। জাহাজ বিক্রীত হইলে এক জন সাহেব নীলাম-স্থলে উপস্থিত হইলেন। এই জাহাজ ক্রয় করিতে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। নিজের অভীপ্সিত দ্রব্য একজন সামান্য সরকারের হস্তগত হইয়াছে শুনিয়া, সাহেব রামদুলালের নিকট যাইয়া, জাহাজ চাহিলেন। কিন্তু রামদুলাল ক্রীত দ্রব্য ছাড়িতে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে অনেক তর্ক বিতর্কের পর রামদুলাল এক লক্ষ টাকা লইয়া জাহাজ খানি সাহেবের নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। ন্যায়ানুসারে এই লক্ষ

টাকা মদন মোহনের প্রাপ্য। রামদুলাল ইচ্ছা করিলেই লাভাংশ আত্মসাৎ করিয়া প্রভুর সমস্ত টাকা ফিরাইয়া দিতে পারিতেন। মদন মোহন ইহার কিছুই অবগত ছিলেন না, সুতরাং রামদুলালের কিছুই করিতে পারিতেন না। কিন্তু রামদুলালের চরিত্র পবিত্র ও উন্নত ছিল। তিনি আত্মশাসন-বলে এই পাপ-জনক কার্য্য হইতে বিরত হইলেন। অধিকন্তু প্রভুর অনুমতি ব্যতিরেকে জাহাজ কিনিয়াছেন বলিয়া, রামদুলাল নানা প্রকার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। এই রূপ শঙ্কিত-হৃদয়ে তিনি মদন মোহন দত্তের নিকট এক লক্ষ টাকা রাখিয়া ঘটনার আদ্যোপান্ত বিবৃত করেন।

মদন মোহন অর্থ-গৃধ্নু ও অনুদার ছিলেন না। তিনি সমস্ত বিবরণ শুনিয়া ঐ টাকা গ্রহণ করিলেন না। এক লক্ষ টাকা রামদুলালকে তাঁহার পবিত্র চরিত্রের পুরস্কার স্বরূপ দান করি[illegible]। রামদুলাল এই লক্ষ টাকা লইয়া বাণিজ্য করিতে [illegible] এবং আপনার পরিশ্রম, সৎস্বভাব ও কার্য্য-নৈপুণ্যে [illegible] ধনী হইয়া উঠেন। ৭৩ বৎসর বয়সে রামদুলালের [illegible] প্রাপ্তি হয়। তাঁহার এত সম্পত্তি ছিল যে, লোকে তাঁহাকে কুবের বলিয়া নির্দ্দেশ করিত। অনেক সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় ও স্বদেশীয়ের নিকট রামদুলালের বিলক্ষণ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। কেবল চরিত্র-গুণেই রাম দুলাল এই রূপ বিপুল অর্থ উপার্জ্জন ও প্রভূত সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ বাগ্মী রামগোপাল ঘোষও দরিদ্রের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। রামগোপাল অধ্যবসায়-বলে সুশিক্ষিত ও সুপণ্ডিত হইয়া সাধারণের আদরণীয় হইয়া ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা-শক্তি নিরতিশয় চিত্ত-বিমোহিনী ছিল। বাগ্মিতা ও সদাশয়তার জন্য রামগোপাল ঘোষ সবিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার উপর

লোকের এরূপ অটল বিশ্বাস ছিল যে, একদা এক জন ধনী মহাজন কোনও খত লিখিয়া না লইয়া তাঁহাকে এক লক্ষ টাকা ধার দেন। এ জন্য আত্মীয় লোকে মহাজনকে নির্ব্বোধ বলাতে মহাজন অম্লান বদনে কহিয়াছিলেন, "পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদিত হইলেও রামগোপাল আমাকে ঠকাইবে না।" চরিত্রের বলে লোকে এই রূপ শ্রদ্ধাস্পদ ও বিশ্বাস-ভাজন হইয়া থাকে।

বজ্রপাতের আশঙ্কা।

বজ্রপাত নিরতিশয় ভয়ঙ্কর ঘটনা। এই ভয়ঙ্কর ঘটনা নিবারণ জন্য বিভিন্ন প্রকার রীতি প্রচলিত আছে। সূক্ষ্ম রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে, কতকগুলি বৈজ্ঞানিক নিয়মের বলে এই সকল রীতি জনসমাজে বদ্ধমূল হইয়া সাধারণের আস্থা ও আদর আকর্ষণ করিয়াছে।

বজ্রপাত তাড়িত প্রবাহ-মূলক। তড়িৎ দুই প্রকার, যৌগিক ও বিয়োগিক*। এই দ্বিবিধ তড়িৎ বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের

---

* এক খণ্ড কাচ বা এক খণ্ড গালা লইয়া উহাকে রেশমি রুমাল দিয়া ঘর্ষণ করিলে দৃষ্ট হইবে, ঐ ঘর্ষিত স্থান কাগজ খণ্ড, কাষ্ঠচূর্ণ, পালক প্রভৃতি লঘু বস্তু সমূহকে আকর্ষণ করে; এবং এই সকল লঘু বস্তু উক্ত ঘর্ষিত স্থানে কিয়ৎক্ষণ সংলগ্ন থাকিয়া প্রতিক্ষিপ্ত হয়। এই আকর্ষণ ও প্রতিক্ষেপণ দ্বারা আমরা জানিতে পারি, ঘর্ষিত অংশ তড়িদাক্রান্ত হইয়াছে। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কাচ ও গালার ঘর্ষিত অংশ হইতে বিভিন্ন প্রকৃতির তড়িৎ উৎপন্ন হয়; অর্থাৎ কাচের ঘর্ষিত অংশ যে বস্তু আকর্ষণ করে, গালার ঘর্ষিত অংশ সেই বস্তু প্রতিক্ষেপণ করে। এই দুই প্রকার তড়িৎ "যৌগিক" ও "বিয়োগিক" এই দুই পৃথক্ সংজ্ঞায় উক্ত হয়; অর্থাৎ প্রথমটীকে (কাচ হইতে উৎপন্ন) যৌগিক, দ্বিতীয়টীকে (গালা হইতে উৎপন্ন) বিয়োগিক বলা যায়। এই দুই প্রকার তড়িৎকে কেহ "পুষ্ট তাড়িত" ও "ক্ষীণ তাড়িত"; কেহ পুরুষাকার ও স্ত্রী-আকার, কেহ বা সজীব

সমুদয় পদার্থে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যৌগিক ও বিয়োগিক তড়িতের বিশেষ প্রকৃতি এই যে, উহাদের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণী শক্তি আছে; অর্থাৎ যে পদার্থে যৌগিক তড়িৎ বর্ত্তমান থাকে, তাহার সমীপবর্ত্তী অন্য পদার্থে যদি বিয়োগিক তড়িৎ অবস্থান করে, তাহা হইলে এই দুই প্রকার তড়িতের একটীর সহিত অপরটী মিলিত হইয়া যায়। কিন্তু দুই পদার্থে একই প্রকার তড়িৎ বর্ত্তমান থাকিলে ঐ সজাতীয় তড়িদ্‌বিশিষ্ট পদার্থদ্বয় পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এই আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ উভয়বিধ তড়িতেরই বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম।

পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, মেঘে প্রায়ই যৌগিক তড়িৎ বর্ত্তমান থাকে। যদি কোন কোন মেঘে বিয়োগিক তড়িৎ অবস্থান করে, তাহা হইলে এই উভয়বিধ তড়িৎ পরস্পর সম্মিলিত হইয়া যায়। এই [illegible] অতি উজ্জ্বল তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, [illegible] 'বিদ্যুৎ' নামে নির্দ্দেশ করি। মেঘখণ্ডদ্বয় এই [illegible] এরূপ বেগে আসিয়া মিলিত হয় যে, তাহার সংঘাতে [illegible] বায়ু-রাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, এই বিক্ষেপণে যে ভয়ঙ্কর শব্দ সমুত্থিত হয়, তাহাকে 'মেঘ গর্জ্জন' বা 'বজ্রনির্ঘোষ' বলা যায়। বজ্রপাত এই বিভিন্ন জাতীয় তড়িতের সম্মিলন-ফল। পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে উপরিস্থ মেঘের তড়িৎ পৃথিবীর বিয়োগিক তড়িতের সহিত মিলিতে চেষ্টা করে। তড়িতের প্রকৃতিসিদ্ধ সংক্রামণ-বলে পৃথিবীর বিয়োগিক তড়িৎ একস্থানে

ও বিপরীত তড়িৎ কহেন। কিন্তু ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ গণিত শাস্ত্র হইতে এই দ্বিবিধ তড়িতের দুটী সংজ্ঞা উপলব্ধ করিয়াছেন। আমরা এ স্থলে উক্ত গণিত শাস্ত্রেরই অনুসরণ করিয়া "যৌগিক" ও "বিয়োগিক" নাম রাখিলাম।

একত্রিত হইলে মেঘের তাড়িত প্রবাহ প্রচণ্ড বেগে পৃথিবীতে আসিয়া সেই স্থলে পতিত হয়; ইহাকেই 'বজ্রপাত' বলে।

এরূপ অনেক গুলি পদার্থ আছে যে, তৎসমুদয় দিয়া তাড়িত প্রবাহ সহজে চালিত হইতে পারে। এই সমুদয় পদার্থকে 'সতাড়িত' বা তড়িৎপরিচালক নামে নির্দ্দেশ করা যায়। যে সকল পদার্থ দিয়া তড়িৎ সহজে চালিত হইতে পারে না, সেই সকল পদার্থকে 'নিস্তাড়িত' বা তড়িদপরিচালক বলা গিয়া থাকে। সকল প্রকার ধাতু, সমুদ্র-জল, নির্ঝর-জল, বৃষ্টির জল, বরফ, সজীব উদ্ভিদ্, সজীব প্রাণী, আর্দ্র মৃত্তিকা ও প্রস্তর প্রভৃতি তড়িতের উত্তম পরিচালক, এবং মোম, কাচ, হীরক, মণি, রেশম, পশম, শুষ্ক কাগজ প্রভৃতি তড়িতের অপরিচালক। অপরিচালক পদার্থ তড়িৎ-প্রসারণের নিয়ত বাধা দিয়া থাকে। এক খণ্ড ধাতু দিয়া তড়িৎ পরিচালিত হইলে, সেই ধাতুর কোন ব্যতিক্রম হয় না; কিন্তু এক খণ্ড কাচে তাড়িত প্রবাহ লাগিলে সেই কাচ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়*। যে সকল পদার্থ তড়িতের উৎকৃষ্ট পরিচালক, সেই সকল পদার্থ স্থান বিশেষে সুব্যবস্থিত করিয়া রাখিলে বজ্রপাতের আশঙ্কা নিবারিত হইতে পারে। যেহেতু, পৃথিবীর বিয়োগিক তড়িৎ এই সকল পরিচালক পদার্থ দিয়া শীঘ্র শীঘ্র উঠিয়া মেঘের যৌগিক তড়িতের সহিত সম্মিলিত হয়; সুতরাং মেঘস্থিত তাড়িত প্রবাহ আর পৃথ্বীতলে সমুপস্থিত হইতে পারে না।

বজ্রপাত নিবারণ জন্য একণে সূক্ষ্মাগ্রভাগ লৌহদণ্ড আবাস-

* এই কারণে মনুষ্য প্রভৃতি সজীব প্রাণী বজ্রাহত হইলে তাহার শরীরে কোন রূপ বিকার লক্ষিত হয় না, কেবল তড়িতের প্রবেশ ও নির্গমন পথে এক একটী মাত্র চিহ্ন থাকে। সজীব প্রাণী তড়িৎপরিচালক; সুতরাং তড়িৎ-প্রবাহ সহজেই উহার গাত্র ভেদ করিয়া চলিয়া যায়।

গৃহের উপরিভাগে প্রোথিত রাখিবার রীতি [illegible] প্রচলিত আছে। ইহাকে বিদ্যুদ্দণ্ড কহে। আমেরিকার প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তর ফ্রাঙ্কলিন প্রতীচ্য ভূখণ্ডে এই বিদ্যুদ্দণ্ড ব্যবহারের প্রণালী প্রথম উদ্ভাবন করেন। মেঘের নিম্নভাগ অপেক্ষা লৌহদণ্ডের অগ্রভাগ পরিচালক ও সূক্ষ্ম। এজন্য উপরিস্থ মেঘে যে যৌগিক তড়িৎ বিযুক্ত ভাবে অবস্থান করে, তাহা পৃথিবীতে আসিতে না আসিতেই পৃথিবীর বিয়োগিক তড়িৎ উক্ত লৌহ দণ্ডের সূক্ষ্মাগ্রভাগ দিয়া বহির্গত হইয়া, মেঘস্থিত তড়িতের সহিত সম্মিলিত হয়। সুতরাং অবস্থান গৃহে বজ্র পতিত হইতে পারে না। এই নিমিত্তই আমাদের দেশে দেবমন্দিরের উপরিভাগে লৌহ, তাম্র বা পিত্তল-নির্ম্মিত সূক্ষ্মাগ্রভাগ ত্রিশূল ও চক্র স্থাপনের [illegible] আছে। যে কারণে সূচ্যগ্র লৌহ দণ্ড বজ্রপাত নিবারণ [illegible], ঠিক সেই কারণেই দেব-মন্দির-স্থাপিত ধাতব ত্রিশূল ও চক্র [illegible] পতনের ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে*। হিন্দুদিগের এতদ্বিষয়ক [illegible]

---

* তাড়িত শাস্ত্রে হিন্দুদিগের যে জ্ঞান ছিল, প্রসঙ্গক্রমে এই [illegible] তাহার আর একটী প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে। বঙ্গদেশের পূর্ব্ব প্রদেশে গ্রীষ্মকালে যে সকল শস্য জন্মে, তাহার অধিকাংশ শিলাবৃষ্টিতে [illegible] হইয়া যায়, এজন্য এক ব্যক্তি এই শিলাবৃষ্টি নিবারণে নিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাকে "শিলারি" কহে। শিলারি গ্রীষ্মকালের তিন চারি মাস সর্ব্বদা শুচি হইয়া শুভ্র ধারণ, অতৈল স্নান ও নিরামিষ ভোজন করে। যখন আকাশে শিলামেঘ দৃষ্ট হয়, তখন শিলারি আপনার কেশবন্ধন খুলিয়া, কপালে রক্তচন্দন সিন্দুর চিহ্ন, দক্ষিণ হস্তে একটী দীর্ঘাকার ত্রিশূল ও বাম হস্তে একটী মহিষশৃঙ্গ নির্ম্মিত ভেরী ধারণ পূর্ব্বক প্রায় উলঙ্গভাবে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ভেরী বাদন করিতে করিতে শস্য ক্ষেত্রে গমন করে। শিলারি শিলামেঘকে ক্ষেত্রের যে প্রান্তে দেখিতে পায়, সেই প্রান্তে গিয়া হস্তস্থিত ত্রিশূল ভূমিতে প্রোথিত করে, এবং যত ক্ষণ ঐ মেঘ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ও চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া না পড়ে, ততক্ষণ সেই স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া ভেরী বাদন করিতে থাকে। মেঘ যদি বায়ুবেগে অন্য স্থানে গমন করে, তাহাহইলে শিলারিও তাহার পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া সেই মেঘের নিম্নভাগে ত্রিশূল প্রোথিত করে। শিলারির

যে বিশ্বাস ছিল, একণে তাহার আরও একটী প্রমাণ পাওয় গিয়াছে। পূর্ব্বে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের সংস্কার ছিল যে, মেঘস্থিত তাড়িৎ প্রোথিত লৌহ শলাকার উপর পতিত হইয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করে, এজন্য কোন অনিষ্ট সংঘটিত হয় না। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া, তাঁহারা লৌহ দণ্ড গৃহের গাত্র-সংলগ্ন না করিয়া, কতিপয় অপরিচালক শুষ্ক কাষ্ঠ দণ্ড দ্বারা ভিত্তির সহিত আবদ্ধ করিয়া, গৃহের কিঞ্চিৎ অন্তরে প্রোথিত করিতেন। কিন্তু এক্ষণে বহু পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, মেঘের তড়িৎ লৌহ শলাকায় আইসে না। পার্থিব তড়িৎই লৌহ শলাকার সূচাগ্রভাগ হইতে অল্প অল্প বিকীর্ণ হইয়া মেঘের তড়িতের সহিত মিলিত হইয়া থাকে। সুতরাং লৌহ শলাকাগুলি এইরূপ প্রক্রিয়া-বলে প্রোথিত শলাকোপরের উপরিস্থ মেঘের শিলাবর্ষণী শক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়।

শিলারি যে উপায়ে মেঘের শিলাবর্ষণী শক্তি বিনষ্ট করে, তাহা অতি উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান-মূলক। শিলার উৎপত্তির কারণ তাড়িৎ। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন, ভিন্ন জাতীয় তড়িদ্বিশিষ্ট মেঘ খণ্ডদ্বয় পরস্পর ঊর্দ্ধাধোভাবে থাকিলে, এক মেঘের জলকণা সমূহ ভিন্ন জাতীয় তড়িতের আকর্ষণে অন্য মেঘে যায় এবং সেই মেঘের তড়িদংশ প্রাপ্ত হইয়া জলকণা সকল সংগ্রহ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ স্থূলাবয়ব হইলে উহারা আবার তড়িতের বিক্ষেপণ ও আকর্ষণে পূর্ব্বতন মেঘে উপস্থিত হয়; এই মেঘে যে জলকণা থাকে, তাহা দ্বারা আবার পুষ্টাবয়ব হইয়া মেঘান্তরে যায়। এইরূপে জলকণা সকল সজাতীয় ও বিজাতীয় তড়িতের বিক্ষেপন ও আকর্ষণে পর্য্যায়ক্রমে মেঘ হইতে মেঘান্তরে যাইয়া বিলক্ষণ জমাট ও ভারি হইলে মাধ্যাকর্ষণ-বলে পৃথিবীতে পতিত হয়। ইহাকেই শিলাবৃষ্টি কহে। যদি কোন উপায়ে একতর মেঘখণ্ড-স্থিত তড়িতের আকর্ষণী শক্তি বিনষ্ট করা যায়, তাহা হইলে শিলার উৎপত্তি হইতে পারে না। শিলারির হস্তস্থিত ত্রিশূল সমধিক তড়িৎ-পরিচালক; এতন্নিবন্ধন পৃথিবীর তড়িৎ উক্ত ত্রিশূলাগ্র হইতে উত্থিত হইয়া মেঘস্থিত তড়িতের সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়। এই সম্মিলন বশতঃ মেঘস্থিত তড়িতের আর কোন কার্য্যকারিতা থাকে না। কার্য্যকারিতার অভাব নিবন্ধন শিলারও উৎপত্তি হইতে পারে না। শিলারির শঙ্খ ধারণ, ভেরী বাদন প্রভৃতি বাহ্য আড়ম্বর মাত্র।

বৃক্ষাদির গাত্র-সংলগ্ন করিয়া রাখা হয়। হিন্দুগণ এই কারণে বজ্রনিবারক ত্রিশূলাদি মন্দিরের উপরিভাগে প্রোথিত রাখিবার নিয়ম করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই। এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক, হিন্দু দেবমন্দির-স্থাপিত ত্রিশূলাদির সহিত পৃথিবীর সংযোগ নাই। উক্ত ত্রিশূল প্রভৃতি কেবল মন্দিরের উপরি ভাগের সহিতই সংলগ্ন থাকে। হিন্দুগণ কেবল মন্দিরস্থ তড়িতের নিঃসারণ জন্যই এই রূপ প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন; অর্থাৎ মন্দিরে যে তড়িৎ থাকে, তাহা ত্রিশূলাগ্র দিয়া চারিদিকে বিকীর্ণ হয় এবং মেঘের তড়িতের সহিত সম্মিলিত হইয়া উহাকে নিশ্চেষ্ট করে। কিন্তু এক্ষণে এই প্রণালী সংস্কৃত হইয়া অন্যরূপ ধারণ করিয়াছে। ইদানীন্তন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মতে বিদ্যুদ্দণ্ড সকল আবাস-গৃহের উপরিভাগ ভেদ করিয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত রাখা কর্ত্তব্য। এই লৌহ দণ্ড বাটীর আয়তন বিশেষে ৬ কিম্বা ১০ ফুট দীর্ঘ ও ছাদের উপরিভাগে ঠিক লম্বভাবে অবস্থাপিত হইবে। দণ্ডের অগ্রভাগ বিন্দুবৎ সূক্ষ্ম ও তাম্র-নির্ম্মিত হওয়া উচিত, এবং অধোভাগের বেড় অন্যূন ৩ ইঞ্চ থাকা আবশ্যক। এবম্বিধ বিদ্যুদ্দণ্ডের দুটী কার্য্যকারিতা আছে, একটী বজ্রপাত-নিবারণ, অপরটী যখন বজ্রপাত অনিবার্য্য হয়, তখন আবাস-গৃহ রক্ষণ। বিন্দুবৎ সূক্ষ্মাগ্রে তড়িৎ অবিকল থাকিতে পারে না; উহা শীঘ্র শীঘ্র বিকীর্ণ হইয়া মেঘের যৌগিক তড়িতের সহিত মিলিত হইয়া যায়। অধিকন্তু লৌহ অপেক্ষা তাম্র সমধিক তড়িৎ-পরিচালক; এজন্য তাম্র নির্ম্মিত সূক্ষ্মাগ্র দিয়া অধিকতর সত্বরতার সহিত বিকীরণ কার্য্য সম্পন্ন হয়। মৃত্তিকা-প্রোথিত লৌহ দণ্ড গৃহের ছাদ ভেদ করিয়া থাকাতে, মৃত্তিকা ও গৃহের তড়িৎ উভয়ই লৌহ দণ্ড দিয়া যুগপৎ সঞ্চালিত হইয়া, চারিদিকে বিকীর্ণ হয়, এবং মেঘের

তড়িতের সহিত সম্মিলিত হইয়া উহাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া ফেলে। সুতরাং আবাস-গৃহে বজ্রপতনের আশঙ্কা থাকে না। যদি ঘটনাক্রমে ভূমি ও গৃহের তড়িৎ-প্রবাহ এত অধিক হয় যে, শীঘ্র লৌহ দণ্ডের সূচ্যগ্রভাগ দিয়া বিকীর্ণ হইতে পারে না, তাহাহইলে মেঘের তাড়িত প্রবাহ আসিয়া সেই দণ্ডে পতিত হয় এবং দণ্ডের পরিচালকতা গুণবশতঃ উহার অভ্যন্তর দিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করে; সুতরাং বজ্রপাত অনিবার্য্য হইলেও বিদ্যুদ্দণ্ড সকল আবাস-গৃহ অক্ষুণ্ণ রাখে। সজীব বৃক্ষাদি যদিও পরিচালক, তথাপি উহা বিন্দুবৎ সূচ্যগ্র নয় বলিয়া শীঘ্র পৃথিবীর তড়িৎ বিকীর্ণ করিতে পারে না; প্রত্যুত পরিচালকতা বশতঃ পৃথিবীর তড়িৎ বৃক্ষে আসিয়া একত্রিত হইয়া, মেঘের তড়িতের সহিত মিলিতে চেষ্টা করে, এজন্যই বৃক্ষে সচরাচর বজ্রপাত হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তর ফ্রাঙ্কলিন কহেন, যে গৃহে বিদ্যুদ্দণ্ড সংযোজিত নাই, বৈদ্যুতিক উপদ্রবের সময় সেই গৃহের মধ্য ভাগে অবস্থান করা বিধেয়; কারণ তড়িৎ সচরাচর গৃহের প্রাচীর ভেদ করিয়াই প্রবাহিত হইয়া থাকে। গৃহের অভ্যন্তরে অধিক পরিমাণে ধাতুময় পদার্থ থাকিলে তৎসমুদয় বিদ্যুদ্দণ্ড হইতে দূরে রাখা বিধেয়। যদি গৃহের বহির্ভাগে অধিক পরিমাণে ধাতব পদার্থ থাকে; তাহাহইলে বিদ্যুদ্দণ্ডের সহিত সেই সকল পদার্থের সংযোগ থাকা আবশ্যক, নতুবা ঐ পদার্থসমূহে তড়িতের আধিক্য বশতঃ তাড়িত প্রবাহ সঞ্চালিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তাড়িতপ্রবাহের এই সঞ্চালন আশঙ্কাতেই আমাদের দেশে বিদ্যুৎ-প্রকাশের সময় ঘটী বাটী প্রভৃতি ঘরে তুলিবার নিয়ম আছে।

মেঘ হইতে মেঘান্তরে তড়িৎ গমনের সময় যেমন আলোক ও শব্দ ইন্দ্রিয়-গোচর হয়, লৌহ দণ্ড বা ত্রিশূলের অগ্রভাগ হইতে

তড়িৎ গমনের সময় যে রূপ আলোক ও শব্দ কিছুই দর্শন ও শ্রবণ-পথে নীত হয় না। যে কারণে এই বৈসাদৃশ্য জন্মে তাহা অতি সহজবোধ্য। মেঘের প্রান্ত ভাগ স্থূল ও অপকৃষ্ট পরিচালক, সুতরাং তাহা হইতে তড়িৎ শীঘ্র শীঘ্র নির্গত হয় না; ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া যখন পরিমাণে অধিক হয়, তখনই উহা মেঘান্তরের তড়িতের সহিত মিলিত হইয়া থাকে। এই রূপে এককালে অধিক পরিমাণে তড়িৎ বায়ু ভেদ করাতে আলোক ও শব্দ উভয়ই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে লৌহ দণ্ড বা ত্রিশূলের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম ও সুপরিচালক। এতন্নিবন্ধন পৃথিবীর তড়িৎ তাহাতে অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না; অত্যল্প তড়িৎ একত্রিত হইলেই, তাহা চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া মেঘের তড়িতের সহিত মিলিত হইয়া যায়। সুতরাং আলোক বা শব্দ কিছুই ইন্দ্রিয়বোধ্য হয় না।

কিয়দ্দূরে তাল, নারিকেল প্রভৃতি উচ্চ বৃক্ষ থাকিলে গৃহে বজ্র পতনের আশঙ্কা নিবারিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সজীব উদ্ভিদ্ তড়িৎ-পরিচালক। এই পরিচালকত্ব গুণ বশতঃ মেঘের তড়িৎ-প্রবাহ বৃক্ষের উপর দিয়া যায়, সুতরাং গৃহাদির কোন অনিষ্ট হয় না। বৃক্ষ যে তড়িৎ-পরিচালক, ইহা আমাদের শাস্ত্রকারগণও জানিতেন। পূর্ব্বে আমাদের বাস-গৃহের চারি দিকে নারিকেলাদি বৃক্ষ থাকাতেই বোধ হয় তাঁহারা দেব-মন্দিরের ন্যায় বাস-গৃহের উপরিভাগে ত্রিশূলাদি প্রোথিত করিবার ব্যবস্থা করেন নাই।

প্রাচীনদিগের মধ্যে বজ্রপাতের নিবারণ সম্বন্ধে দুটী সংস্কার ছিল, একটী জল দ্বারা বজ্রাগ্নির নির্ব্বাণ, অপরটী ভূগর্ভে তড়িতের প্রবেশাক্ষমতা। অনেকে এই প্রাচীন সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তড়িতাঘাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ভূগর্ভে বাস করেন।

জাপানে অদ্যাপি এই রীতি প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। বৈদ্যুতিক উপদ্রব উপস্থিত হইলেই জাপানের অধিপতিগণ বজ্রপাতের আশঙ্কায় ভূগর্ভস্থ গৃহ বিশেষে অবস্থান করেন। এই গৃহের উপরিভাগ জলপূর্ণ থাকে। তড়িৎ ভূগর্ভে প্রবেশ করিতে পারে না, এই সংস্কার ভ্রমাত্মক হইলেও দ্বিতল বা ত্রিতল গৃহ অপেক্ষা ভূগর্ভস্থিত গৃহ যে বজ্রপাতের আশঙ্কা অধিকতর নিবারণ করে, তাহা পণ্ডিতগণও স্বীকার করেন। অধিকন্তু জাপানের অধিপতিদিগের মধ্যে ভূগর্ভস্থ গৃহের উপরিভাগ জল-পূর্ণ রাখিবার যে রীতি আছে, তাহার সহিত একটী গূঢ় বৈজ্ঞানিক সত্য সংমিশ্রিত দৃষ্ট হয়। জল তড়িতের উৎকৃষ্ট পরিচালক। পরিচালকতা নিবন্ধন মেঘের যৌগিক তড়িৎ জলে আসিলে উহা সহজেই চারিদিকে প্রসৃত হইয়া পড়ে; সুতরাং নিম্নস্থ পদার্থে আর সংক্ষোভ* লাগিতে পারে না। কিন্তু ইহাতে জলস্থিত মৎস্যাদি তাড়িত প্রবাহ হইতে রক্ষা পায় না। জলে যদি কোন জীবিত প্রাণী থাকে, তাহা হইলে তড়িতের সংক্ষোভে তৎসমুদয় বিনষ্ট হইয়া যায়। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে কোন একটী হ্রদে বজ্রপাত হওয়াতে সেই হ্রদের সমুদয় মৎস্যই নষ্ট হইয়াছিল। নিকটবর্ত্তী অধিবাসিগণ এই মৃত মৎস্য ৮ খানি গাড়ি বোঝাই করিয়া লইয়া যায়।

প্রাচীন সময়ে সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, সিন্ধুঘোটক ও সর্পের চর্ম্ম বজ্র-নিবারক। রোমের সম্রাট অগষ্টস এজন্য সিন্ধুঘোটকের চর্ম্ম-নির্ম্মিত পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। রোমকগণ সিন্ধুঘোটকের চর্ম্ম-নির্ম্মিত তাম্বুও ব্যবহার করিত। [illegible]

* অনেকস্থলে তাড়িত সংক্ষোভেই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। সন্নিকটে বজ্রপাত হইলে তাড়িত প্রবাহ যদি গাত্রে উপনীত হয়, তাহা হইলে মৃত্যু সময়ে সময়ে অনিবার্য্য হইয়া উঠে।

পর্ব্বত বিশেষের পশুপালকগণ অদ্যাপি আপনাদের টুপি সর্প চর্ম্মে আবৃত করিয়া থাকে। এই প্রক্রিয়া বজ্রপাতের প্রকৃত নিবারক কি না, তাহা আজ পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম রূপে নির্ণীত হয় নাই। কিন্তু কোন বিশেষ পদার্থ বা চর্ম্মের পরিচ্ছদ যে সময়ে সময়ে বজ্রপাত নিবারণ করে, তাহা কেহ কেহ স্বীকার করিয়া থাকেন।

বৈদ্যুতিক মেঘাড়ম্বরের সময় ধাতু-নির্ম্মিত কোন গুরু পদার্থ গাত্রে সংলগ্ন রাখা উচিত নহে। শরীর ও ধাতু উভয়ই তড়িতের উৎকৃষ্ট পরিচালক, সুতরাং তড়িৎ ধাতুময় পদার্থ দিয়া শরীরে প্রবাহিত হইতে পারে। এই তাড়িত সংযোগে প্রাণ বিনষ্ট হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১এ জুলাই কোন একটি কারাগারের প্রশস্ত গৃহে বিংশতি জন কয়েদী ছিল, উহাদের মধ্যে প্রধান কয়েদী লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। হঠাৎ সেই কারাগারে বজ্রপাত হইল, ইহাতে শৃঙ্খলাবদ্ধ কয়েদীর প্রাণ বিনষ্ট হয়, অপর অনেক জন জীবিত থাকে। এ স্থলে ধাতব শৃঙ্খল দিয়া তড়িতের গতি হওয়াতেই কয়েদী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গুরু-ভার ধাতব পদার্থই এই রূপ অনিষ্টের উৎপাদন করে। অঙ্গুরীয়ক প্রভৃতি ধাতু-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ অঙ্গ-সংলগ্ন থাকিলে তাদৃশ বিপদের সম্ভাবনা নাই।

বজ্রপতনের আশঙ্কায় অনেকে একস্থানে একত্রিত হইয়া সাহস সংগ্রহের জন্য কথোপকথনে প্রবৃত্ত হয়। ইহাতে অনিষ্টের আশঙ্কা নিবারিত না হইয়া বরং বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এক স্থানে বহুসংখ্য লোক অবস্থান করিলে পরস্পরের ঘর্ম্ম প্রভৃতিতে সেই স্থানের বায়ু শীঘ্রই আর্দ্র হইয়া যায়। জলের ন্যায় আর্দ্র বায়ুও তড়িতের উৎকৃষ্ট পরিচালক। এই আর্দ্র বায়ুতে তড়িৎ একত্রিত হইলেই বিপদ ঘটিতে পারে।

ঝড় বৃষ্টির সময় প্রান্তরে অথবা অন্য কোন শূন্য স্থানে

বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। আকাশে ঘোরতর মেঘের আবির্ভাব ও তৎসঙ্গে ঝড় বৃষ্টি হইলে কেহ কেহ পথিকদিগকে বায়ুর প্রতিকূল দিকে ধাবমান হইতে পরামর্শ দিয়া থাকেন। বৈজ্ঞানিক নিয়ম পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, ইহার এই একটী কারণ অনুমিত হয়ঃ—প্রতিকূল দিকে ধাবমান হইতে ধাবমান-কারীর সম্মুখ ভাগের বায়ু-রাশি ঘনীভূত ও পশ্চাদ্ভাগের বায়ু লঘুতর হইয়া উঠে। সচরাচর ঘনীভূত বায়ু-পূর্ণ স্থান অপেক্ষা লঘুতর বায়ু-পূর্ণ স্থানেই বজ্রপাত হয়। যেহেতু ঘন বায়ুর ন্যায় লঘু বায়ু-রাশি তাড়িত প্রবাহের গতি রোধ করিতে পারে না, সুতরাং লঘু বায়ু-ময় স্থানেই উহার গতি হইয়া থাকে। বজ্র-পতনের সম্ভাবনা থাকিলে এই নৈসর্গিক নিয়মের বলে ধাবমান-কারীর পশ্চাদ্ভাগের ভূমিতেই উহা পতিত হয়। কিন্তু মনুষ্য সম্বন্ধে এই প্রক্রিয়া তাদৃশ ফলোপধায়িনী হয় না। দ্রুতগতি-শীল বাষ্পীয় পোত ও বাষ্পীয় শকটের সম্বন্ধেই ইহার কার্য্য-কারিতা দৃষ্ট হয়*। বৈদ্যুতিক উপদ্রবের সময় বৃক্ষতল আশ্রয় করা নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য। পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে, বৃক্ষ তড়িতের উৎকৃষ্ট পরিচালক; বিশেষতঃ জলে সিক্ত হইলে উহার পরিচালকতা শক্তি অধিকতর বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। এত-ন্নিবন্ধন বৃক্ষাদিতে বজ্রপতনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। সুতরাং বৃক্ষ হইতে কিঞ্চিৎ অন্তরে থাকা সর্ব্বাংশে বিধেয়। ফ্রাঙ্কলিনের

* এবিষয়ের একটী উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। একদা এক খানি অর্ণবপোত প্রচণ্ড বায়ুর প্রতিকূলে সবেগে চালিত হইতেছিল; ইহাতে পোতের সম্মুখভাগের বায়ু ঘনীভূত ও পশ্চাদ্ভাগের বায়ু লঘুতর হইয়া যায়। এই সময়ে হঠাৎ জাহাজের পশ্চাদ্ভাগের জল মধ্যে বজ্রপাত হইল। বলা বাহুল্য, পশ্চাতের বায়ু লঘুতর হওয়াতেই ঐ স্থানে বজ্রপতন হইল; অন্যথা উহা জাহাজের গুণ-বৃক্ষ অথবা অন্য কোন উচ্চ স্থানে নিশ্চয়ই পতিত হইত।

বৃক্ষ ১৫ ফীট দূরে থাকিলে অনিষ্টের তাদৃশ সম্ভাবনা থাকে না। ফিরলে নামক অন্য এক জন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত পাঁচ কিম্বা ছয় হস্ত অন্তরে থাকিবার পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু যদি বৃক্ষাদি অপেক্ষাকৃত উন্নত হয়, তাহাহইলে কিছু অধিক দূরে থাকাই পরামর্শ-সিদ্ধ। উন্নত বৃক্ষের ন্যায় বিদ্যুদ্দণ্ড-রহিত উন্নত গৃহের নিকটে থাকাও অনুচিত। সচরাচর সমুন্নত পদার্থেই বজ্রপাত হইয়া থাকে। কারণ, উন্নতা হেতু উহা মেঘের অধিক নিকটবর্ত্তী হয়, এই নিকটবর্ত্তিতা প্রযুক্ত মেঘের ও সেই উন্নত পদার্থের তড়িৎ শীঘ্র শীঘ্র সম্মিলিত হইতে চেষ্টা করে।

শিষ্টাচার।

অশিষ্টকে কেহই আদর করে না। সাধারণ সমাজেও অশিষ্ট ব্যক্তি লোকের নিকট নিন্দনীয় হইয়া থাকে। লোক-সমাজে শিষ্টতার যে রূপ রীতি বর্ত্তমান আছে, ব্যবহারের সময় সর্ব্বতোভাবে সেই রূপ রীতির অনুসরণ করা কর্ত্তব্য; অন্যথা কখনই লোকানুরাগ লাভ করিতে পারা যায় না। অসাধারণ কার্য্য দ্বারা প্রশংসা লাভ করা সকলের সুসাধ্য নহে, এবং সকল সময়ে এই কার্য্য সম্পাদনের সুযোগও উপস্থিত হয় না। কিন্তু অভিবাদন, হস্তস্পর্শ, সপ্রণয়সম্ভাষণ ও অভিনন্দন দ্বারা লোকের হৃদয় আকর্ষণ করা সহজ ও সকলের ক্ষমতার আয়ত্ত। এই সকল বিষয়ে অবহেলা করিলে লোকানুরাগ ও লোকখ্যাতি লাভ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। কোন বিষয়ে কোন অসাধারণ গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তির শিষ্টাচারের ত্রুটী লক্ষিত হইলে লোকে সেই ত্রুটী তত গ্রাহ্য করে না, কিন্তু সাধারণের এই রূপ কোন ত্রুটী দেখিলে তাহারা নিরতিশয় বিরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকে।

শিক্ষকের নিকট বা পুস্তক পাঠে ঈদৃশ শিষ্টাচার শিক্ষা হয় না। ইহা শিখিতে হইলে মনোযোগ পূর্ব্বক লোক-ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যদি শিষ্টদিগের সহিত সংস্পর্শ ও সাধারণকে প্রীত করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহাহইলে স্বভাবতই শিষ্টাচরণে প্রবৃত্তি জন্মে। যে শিষ্টাচরণে উপেক্ষা করে, তাহার সহিত কেহই শিষ্ট ব্যবহার করে না, সুতরাং সহজেই তাহার সম্মান নষ্ট হয়। অভ্যাগত ও বাহ্যাড়ম্বর-প্রিয় ব্যক্তিদিগের সহিত যথোচিত সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য; কিন্তু তাহাদিগকে একেবারে আকাশে তোলা উচিত নহে। এরূপ করিলে লোকে তাহাকে স্তাবক ও মিথ্যাবাদী বলিয়া অবিশ্বাস করে।

অনেকে সামান্য শিষ্টাচরণে এরূপ কৌশল দেখান যে, সহজেই লোকের হৃদয় আকৃষ্ট হইয়া যায়। যাঁহাদিগের সহিত কোন রূপ ঘনিষ্ঠতা বা গাঢ়তর প্রণয় নাই, আপনাদের মধ্যে তাহাদিগের গৌরব রক্ষা করিবে; অনুজীবিদিগের সহিত স্নিগ্ধ বন্ধুর ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিবে এবং গুণ বিশেষে আদর দেখাইবে। সকলকেই অতিরিক্ত আদর করা ধূর্ত্ততা ও মূঢ়তার কার্য্য। অপরের চিত্তরঞ্জনের সময় আপনারও মানসম্ভ্রমের দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইলে সেই পরামর্শের ঔচিত্য সম্বন্ধে আপনারও মত প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সকল বিষয়ে বাড়াবাড়ি করাও দূষণীয়। তুচ্ছ শিষ্টাচারের অনুরোধে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মের ব্যাঘাত করা মূঢ়তার পরিচায়ক। অধিকন্তু যেখানে শিষ্টতা রক্ষা করিলে নিজের ও অপরের অনিষ্ট ঘটিতে পারে, সেখানে শিষ্ট ব্যবহার করা অশিষ্টের কর্ম্ম।

মেরুজ্যোতিঃ।

বিশাল বিশ্বরাজ্যের যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই প্রকৃতির কৌশলময় কার্য্য-পরম্পরা অনুপম শক্তি বিকাশ করিয়া জীবলোকের অশেষ কল্যাণ সাধন করে। এস্থলে মেরুজ্যোতিঃ নামে যে আলোকের বিষয় বিবৃত হইতেছে, তাহাতে প্রকৃতির কৌশলময় কার্য্য ও মঙ্গলময় ভাব সম্যক্ প্রকাশিত হইবে।

পৃথিবীর সকল স্থানে ঠিক এক সময়ে সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হয় না। সূর্য্য যখন পূর্ব্বদিক লোহিত বর্ণে রঞ্জিত করিয়া আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়, তখন অন্য ভূখণ্ড গাঢ় নিশীথ-কালীন ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তস্থিত প্রদেশদ্বয়ে সূর্য্যের উদয়াস্ত সম্বন্ধে বিশিষ্ট বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়। আমাদের দেশের ন্যায় সেই দেশে প্রতিদিন সূর্য্যের উদয়াস্ত হয় না, অর্থাৎ আমরা যেমন প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় একবার দিবা ও একবার রাত্রি ভোগ করি, সুমেরু ও কুমেরুর অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রদেশের অধিবাসিদিগের ভাগ্যে তেমন ঘটিয়া উঠে না। সুমেরু ও কুমেরুতে বৎসরের মধ্যে একবার দিন ও একবার মাত্র রাত্রি হইয়া থাকে। সূর্য্য সুমেরুতে উদিত হইলে ছয় মাসের মধ্যে অস্তমিত হয় না; সুতরাং এই ছয় মাস কাল সুমেরুতে অবিচ্ছিন্ন দিবা ও কুমেরুতে অবিচ্ছিন্ন রাত্রি থাকে। ছয় মাস পরে যখন কুমেরুতে সূর্য্যের উদয় হয়, তখন কুমেরুতে ছয় মাস কাল অবিচ্ছিন্ন দিবা ও তাহার বিপরীত দিক্‌বর্ত্তী সুমেরুতে উক্ত ছয় মাস কাল অবিচ্ছিন্ন রাত্রি থাকে। পৃথিবীর সুমেরু হইতে প্রায় ৮১২ ক্রোশ দক্ষিণ পর্য্যন্ত এবং কুমেরু হইতে প্রায় ৮১২ ক্রোশ উত্তর পর্য্যন্ত যে সকল দেশ রহিয়াছে, তৎ-

সমুদয়ে এই রূপ পর্য্যায়ক্রমে কিঞ্চিদূন ৪,৩৮০ ঘণ্টা অর্থাৎ কিঞ্চিন্ন্যূন ছয় মাস-ব্যাপী দিবা ও রাত্রি হইয়া থাকে। আষাঢ় মাসের প্রথমার্দ্ধ হইতে পৌষ মাসের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত উত্তর-মেরুতে এবং পৌষ মাসের প্রথমার্দ্ধ হইতে আষাঢ় মাসের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত দক্ষিণ-মেরুতে সূর্য্য নিয়ত প্রকাশিত থাকে।

সুমেরু ও কুমেরুর নিকটবর্ত্তী প্রদেশে এই রূপ বহুদিন-ব্যাপী দিবা ও রাত্রি থাকিলেও তত্রত্য লোকদিগের কোন রূপ অসুবিধা হয় না। যে স্থানে অবিচ্ছিন্ন দিবা থাকে, সে স্থানের অধিবাসিগণ আপনাদের প্রকৃতি অনুসারে প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিবাতেই নিদ্রা যায়। যে স্থলে অবিচ্ছিন্ন রাত্রি থাকে, সে স্থানের অন্তরীক্ষে এক প্রকার নৈসর্গিক আলোক উৎপন্ন হইয়া তমোজাল দূরীভূত করে। এই আলোকই "মেরু জ্যোতিঃ" নামে প্রসিদ্ধ।

আমরা যেমন প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় দশ বা দ্বাদশ ঘণ্টা করিয়া সূর্য্যালোক পাই, মেরু-সন্নিহিত প্রদেশের মনুষ্য প্রভৃতি সমুদয় জীবও তেমনই দীর্ঘকাল-ব্যাপী রাত্রিতে চব্বিশ ঘণ্টায় সাত আট ঘণ্টা করিয়া এই মেরুজ্যোতিঃ পাইয়া থাকে। সুতরাং তত্রত্য জীবগণের আলোকাভাব-জনিত কোন কষ্ট হয় না। তাহারা মেরুজ্যোতির সাহায্যে প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া নিয়মিত সময়ে বিশ্রামসুখ ভোগ করিয়া থাকে।

যখন মেরু-সন্নিহিত দেশে এই অপূর্ব্ব জ্যোতির আবির্ভাব হয়, তখন দূরদেশস্থিত লোকেও সময়ে সময়ে উহা দেখিতে পায়। কোন কোন সময়ে এক মেরু জ্যোতিই রুষিয়ার অন্তঃপাতী মস্কাউ, পোলণ্ডের প্রধান নগর ওয়ারশ, ইতালীর অন্তঃপাতী রোম এবং স্পেনের অন্তর্বর্ত্তী কেদিস্ নগর হইতে দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। ১৮০৪ খ্রীঃ অব্দে ২৩এ অক্টোবর উত্তর প্রদেশে যে মেরুজ্যোতি

প্রাদুর্ভূত হয়, তাহা লণ্ডন নগর হইতে দৃষ্ট হইয়াছিল। লণ্ডনের দর্শকগণ উক্ত মেরুজ্যোতির এই রূপ বর্ণনা করিয়াছেন;—"অপরাহ্ণ সাত ঘটিকার সময় নৈঋত কোণ হইতে বায়ু কোণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক জ্যোতির্ম্ময় ধনু দৃষ্টিগোচর হইল। ইহার পর বোধ হইল, যেন আলোকময় ধূম-রাশি এই ধনুর দক্ষিণ প্রান্ত হইতে উত্তর প্রান্তের অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই উহা আপনার পূর্ব্বতন সন্নিবেশ-দিক্‌ পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধাকাশভাগে অবস্থিত হইল। ইহার পর রাত্রি নয় ঘটিকার সময় উক্ত ধনু উত্তর পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। কিয়ৎকাল মধ্যে উহা স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল এবং নগরের কোন স্থানে অগ্নি-কাণ্ড উপস্থিত হইলে উপরিস্থিত আকাশ যেরূপ রক্তবর্ণ হয়, সেই রূপ লোহিত বর্ণ আলোক-শিখা সকল ঐ ধনুর দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্ত হইতে নিঃসৃত হইতে লাগিল। নিদাঘ কালে সূর্য্য অস্তমিত হইলে দিঙ্মণ্ডল যেমন কিয়ৎ কাল আলোকিত থাকে, উক্ত জ্যোতির্ম্ময় ধনু দ্বারা সমস্ত পরিদৃশ্যমান আকাশও তেমনই আলোকিত হইয়াছিল।"

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শীতকালে ল্যাপলাণ্ড দেশের অন্তর্গত বসিক-কপ্‌ নামক স্থানে যে মেরুজ্যোতিঃ দৃষ্ট হয়, দর্শকগণ তাহার এই রূপ বর্ণনা করিয়াছেন:—"বসিকপের উত্তর দিক্‌বর্ত্তী আকাশে সচরাচর যে কুজ্ঝটিকা-রাশি বিস্তৃত থাকে, তাহা অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় সহসা সুবর্ণ আলোকে রঞ্জিত হইয়া উঠিল, ইহার পর ঐ আলোক সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া উজ্জ্বল পীতবর্ণ ধনুর আকার ধারণ করিল। কিয়ৎকালের মধ্যে এই ধনু স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল, এবং বিচ্ছিন্ন অংশ-সমূহ হইতে অসংখ্য রশ্মিশিখা নির্গত হইল, এই শিখা গুলি পর্য্যায়ক্রমে [illegible] ও হ্রস্ব

হওয়াতে আলোকও একবার পরিষ্কার একবার অল্প হইতে লাগিল। ক্রমে এই রশ্মিজাল বিস্তৃত ধনুর আকার ধারণ করিয়া পৃথিবীর দিকে অবনত হইয়া পড়াতে উহা এক প্রকাণ্ড গোল-কার্ষ্ঠের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। ইহার পর এই ধনু তির্য্যকৃগতিতে উর্দ্ধাভিমুখে উঠিতে আরম্ভ করিল। তির্য্যকৃগতি বশতঃ সর্প-শরীরের সঙ্কোচন ও প্রসারণের ন্যায় উক্ত ধনুর দেহও ক্রমশঃ সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া উজ্জ্বলতর রশ্মিগুচ্ছ উৎপন্ন হইতে লাগিল। এই সময়ে উহার অধোভাগ লোহিত, মধ্য ভাগ হরিৎ এবং উর্দ্ধভাগ উজ্জ্বল পীতবর্ণে শোভিত হইয়া উঠিল। পরিশেষে উহার মনোহর বর্ণ সকল ক্রমে তিরোহিত হইতে লাগিল এবং কিছুকাল পরে সমুদয় একবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল।"

মেরুজ্যোতির তত্ত্ব নির্ণয় জন্য ফ্রান্স দেশ হইতে কতিপয় বিজ্ঞানবেত্তা উত্তর দেশে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ২০০ দিবসের মধ্যে ১৫০ বার ঐ জ্যোতিঃ প্রত্যক্ষ করেন। যে স্থান হইতে উক্ত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ মেরুজ্যোতি দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃত মেরু দেশ হইতে অনেক দূর দক্ষিণে অবস্থিত। প্রকৃত মেরু দেশে যে প্রতিদিন অন্ততঃ একবার করিয়া এই জ্যোতির আবির্ভাব হয়, তাহা পণ্ডিতগণ অনুমান-বলে স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা কহেন, মেরু দেশের যাম্মাসিক রাত্রিকালে মেরুজ্যোতিঃ প্রতি ১৪ বা ১৫ ঘণ্টা পরে আবির্ভূত হয় বটে, কিন্তু সকল সময়ে সমান ভাবে আলোক বিস্তার করে না।

এই অত্যাশ্চর্য্য মেরুজ্যোতির প্রকৃত তত্ত্ব আজ পর্য্যন্ত সম্যক্ রূপে নির্ণীত হয় নাই। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ উহার প্রকৃতি সম্বন্ধে যে পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, মেরুজ্যোতিঃ কেবল তড়িৎ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাঁহারা

যন্ত্র-বিশেষে তাড়িত প্রবাহ চালিত করিয়া মেরুজ্যোতির অনুরূপ আলোক উৎপাদনেও সমর্থ হইয়াছেন*। এই বৈজ্ঞানিকগণ কহেন, যখন সূর্য্যের কিরণে পৃথিবীর জলরাশি হইতে বাষ্প উত্থিত হইতে থাকে, তখন সেই বাষ্পে যৌগিক তড়িৎ এবং পৃথিবীতে বিয়োগিক তড়িৎ বর্ত্তমান থাকে। সূর্য্যের বাষ্পী-করণ-শক্তি-বলে এই দুই পদার্থের তড়িতের পরিমাণ প্রত্যহ কিয়ৎ পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। পরে যখন বাষ্প ঘনীভূত হইয়া বৃষ্টিরূপে পতিত হয়, তখন তাহাতে যৌগিক তড়িতের যে অতিরিক্ত অংশ বিমুক্ত ভাবে থাকে, তাহা বায়ুতে প্রবেশ করে। উপরিস্থিত বায়ুরাশি ক্রমশঃ এই রূপে তড়িদ্বিশিষ্ট হইয়া উঠে। পরিশেষে পৃথিবীর ও বায়ুরাশির এই দুই প্রকার তড়িৎ বায়ু মধ্যে পরস্পর মিলিত হইতে চেষ্টা করে। কিন্তু সূর্য্য কিরণ-সোপান বিস্তার করিয়া উহাদের সম্মিলনের ব্যাঘাত জন্মায়। সূর্য্যালোক প্রভাবে উহারা পৃথিবীর মধ্য ভাগে সম্মিলিত হইতে না পারিয়া যখন যে মেরুতে ছয় মাস-ব্যাপী রাত্রি থাকে, তখন সেই মেরুর উপরিস্থ আকাশে গিয়া পরস্পর সংযোজিত হয়। এই সংযোজনেই উক্ত রূপ জ্যোতিঃ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।

শাস্ত্রালোচনা।

শাস্ত্রালোচনা এক প্রকার আমোদ। যখন নানা প্রকার দুশ্চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়, মন বিরক্ত হইয়া উঠে, তখন

* বায়ু-নিষ্কাশন যন্ত্র দ্বারা কোন একটি কাচের নলের মধ্য ভাগ হইতে সমুদয় বায়ু বাহির করিয়া ফেলিয়া তাহার উভয় প্রান্তস্থিত দুই খণ্ড ধাতুর এক খণ্ডে যৌগিক ও অপর খণ্ডে বিয়োগিক তড়িৎ প্রবেশিত করিলে উক্ত দুই প্রকার তড়িৎ কাচের নলের মধ্যে পরস্পর সম্মিলিত হইয়া মেরুজ্যোতির অনুরূপ আলোক উৎপাদন করে।

নির্জ্জনে শাস্ত্রানুশীলন করিলে সুখে সময় অতিবাহিত হয়। বাগ্মিতা শাস্ত্রচর্চ্চার দ্বিতীয় ফল। বিবিধ সদ্‌গ্রন্থ আয়ত্ত থাকিলে যুক্তি-পূর্ণ-বাক্‌চাতুরী দ্বারা সাধারণের মন আবর্জ্জিত ও অভিমত বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করিতে পারা যায়। শাস্ত্রালোচনায় বিচার শক্তিরও বিকাশ হইয়া থাকে। বুদ্ধি থাকিলে বহু দর্শন দ্বারা প্রাবীণ্য লাভ হয় বটে, কিন্তু সৎপরামর্শ দিয়া কোন দুরূহ কার্য্য সাধন করিতে হইলে নানা শাস্ত্রে বুদ্ধিবৃত্তি সংস্কৃত ও মার্জ্জিত করা আবশ্যক।

শাস্ত্রালোচনার এই প্রকার মহৎ ফল থাকিলেও কেবল উহাতেই আসক্ত থাকিয়া আয়ু ক্ষয় করা নিরবচ্ছিন্ন আলস্য প্রকাশ মাত্র। আলাপের সময় অলঙ্কার-প্রয়োগ ও শব্দঘটা প্রকাশ করা কেবল বিদ্যাভিমানীর কায, এবং বিচারের সময় সকল বিষয়েই শাস্ত্রীয় নিয়মের অনুসরণ করা পণ্ডিত-মূর্খের কর্ম্ম। সহজ জ্ঞান শাস্ত্র-জ্ঞানে মার্জ্জিত হয়, এবং শাস্ত্র-জ্ঞান লৌকিক জ্ঞানে সংস্কৃত ও ফলোপধায়ক হইয়া থাকে। পুস্তক পড়িলেই কিছু বিজ্ঞতা জন্মেনা, পরিদৃশ্যমান জগতের ব্যবস্থা দেখিয়া বিজ্ঞতা উপার্জ্জন করিতে হয়। এই বিজ্ঞতাই শাস্ত্রজ্ঞানে মার্জ্জিত হইলে ফলোপধায়িনী হইয়া থাকে। ধূর্ত্তেরা শাস্ত্রকে দ্বেষ করে, সরল-হৃদয় ব্যক্তিগণ ভক্তি করে, এবং বিজ্ঞেরা কাযে লাগাইয়া সার্থক করেন। বিচার-ক্ষমতা দেখাইয়া বাদি-বিজয় বা বিদ্যা প্রকাশ করা অধ্যয়নের উদ্দেশ্য নহে; বুদ্ধি-বৃত্তি মার্জ্জিত করাই অধ্যয়নের মুখ্য প্রয়োজন। সকল প্রকার পুস্তক সমান ভাবে অধ্যয়ন করা আবশ্যক হয় না। কতকগুলি অংশতঃ মাত্র পড়িতে হয়, কতকগুলিতে নয়নার্পণ করিলেই হয়, কতকগুলি গাঢ় অভিনিবেশ-সহকারে আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করিতে হয় এবং সংগ্রহ মাত্র পাঠ করিয়া বা পরের মুখে শুনিয়া কতকগুলির

ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থ সকল মূল দেখিয়াই পড়া উচিত; যে সকলের সংগ্রহ পাঠে তাদৃশ উপকার হয় না। পরিস্রুত জল ও পরিস্রুত পুস্তক উভয়ই তুল্য; উভয়ই সমান বিস্বাদ ও সমান নীরস।

শাস্ত্রালোচনায় বহুদর্শী হওয়া যায়; অপরের সহিত শাস্ত্রালাপ করিলে বাগ্মিতা জন্মে, এবং রচনা লিখিলে শাস্ত্রজ্ঞান পাকা হইয়া উঠে। রচনার আর একটী গুণ এই, কোন সদ্গ্রন্থ পড়িয়া সেই গ্রন্থোক্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করিলে স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়। যদি রচনা লিখিবার অভ্যাস না থাকে, তাহাহইলে অসাধারণ মেধা থাকা চাই, যদি অন্যের সহিত শাস্ত্রালাপ না হয়, তাহাহইলে বিলক্ষণ প্রতিভা থাকা আবশ্যক, আর যদি অধ্যয়নে ন্যূনতা থাকে, তাহাহইলে সেই ন্যূনতা গোপন করিবার জন্য অনেক উপায় করিতে হয়, নচেৎ বিজ্ঞ-সমাজে সম্ভ্রম রক্ষা পায় না।

ইতিহাস পাঠে বিজ্ঞতা, সাহিত্য পাঠে শব্দ-প্রয়োগ-নৈপুণ্য, পদার্থবিদ্যা পাঠে গাম্ভীর্য্য, ধর্ম্ম-নীতি পাঠে ধীরতা এবং তর্কশাস্ত্র পাঠে বিচার-পটুতা জন্মে। যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শ্রম করিলে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের দৌর্ব্বল্য নষ্ট হয়, তেমনই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শাস্ত্র অনুশীলন করিলে ভিন্ন ভিন্ন মানসিক ন্যূনতা অন্তর্হিত হইয়া থাকে; যাহার চিত্ত নিরতিশয় চঞ্চল, কোন বিষয়েই অধিকক্ষণ অভিনিবিষ্ট থাকে না, তাহার গণিত-শাস্ত্র শিক্ষা করা উচিত; যেহেতু এই শাস্ত্রের কোন প্রক্রিয়া সমাধান করিবার সময় মন একটুকু অন্য বিষয়ে আসক্ত হইলেই পুনর্ব্বার সেই প্রক্রিয়ার মূল হইতে ধরিতে হয়; এই রূপে বারম্বার ঠেকিলেই একাগ্রতা অভ্যস্ত হইয়া আইসে। যাহার বুদ্ধি স্থূল, সূক্ষ্ম বিষয়ে প্রবিষ্ট হয় না, তাহার ন্যায়-শাস্ত্র অনুশীলন করা কর্ত্তব্য; এই

শাস্ত্রের আলোচনা করিলে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে বিচার করিবার ক্ষমতা জন্মে। ব্যবহার-শাস্ত্রেরও বিলক্ষণ উপযোগিতা দৃষ্ট হয়। এই শাস্ত্র পাঠ করিলে দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া অভিমত বিষয় উপপন্ন করিবার ক্ষমতা জন্মে। এই রূপে বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রের অনুশীলনে বিশেষ বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

ভারত-মহিলার দয়া ও প্রভু-ভক্তি।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহি যুদ্ধের সময় যখন চারিদিকে ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত হয়; নর-শোণিত-স্রোতে ভারতবর্ষ যখন প্লাবিত হইয়া যায়, যুদ্ধোন্মত্ত সিপাহিগণ যখন ইংরেজকুল ধ্বংস করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া ইংরেজ শিশু প্রভৃতিকে নির্দয় রূপে হত্যা করে, তখন আমাদের দেশের কতিপয় অসহায় রমণী অবিচলিত সাহসের সহিত যে অসাধারণ দয়া ও প্রভু-ভক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, এ স্থলে তাহার বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

ফৈজাবাদের ডেপুটী কমিশনর কাছারিতে গিয়া শুনিলেন নিকটবর্ত্তী সেনা-নিবাসের সিপাহিগণ যুদ্ধোন্মুখ হইয়াছে। তিনি এই সংবাদ শুনিবামাত্র একজন বিশ্বস্ত চাপরাসী দ্বারা, আপনার স্ত্রীকে অবিলম্বে সমুদয় সম্পত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নদীতটে যাইতে বলিয়া পাঠাইলেন, এই চাপরাসী স্ত্রীর সমভিব্যাহারে যাইবার জন্যও অনুমত হইল। সহধর্ম্মিণীর নিকট সংবাদ পাঠাইয়া ডেপুটী কমিশনর কার্য্যানুরোধে সেনানিবাসে গমন করিলেন। এ দিকে কমিশনরের পত্নী শিবিকারোহণে বিশ্বস্ত ভৃত্যের সঙ্গে নদীকূলাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। সিপাহিগণ এই সময়ে সম্পত্তিলুণ্ঠন ও ইংরেজ বিনাশের নিমিত্ত চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ভীতা ও [illegible] হইয়া ইংরেজ-মহিলা সন্ধ্যা-সমাগমে একটি পল্লীতে প্রবেশ করিলেন। এক জন দয়াশীলা পল্লীবাসিনী আপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া, তাঁহাকে স্বীয় গৃহে আশ্রয় দিয়া, একটী অব্যবহার্য্য তুন্দুরের ভিতর লুকাইয়া রাখিল। বাহকগণ এ দিকে শিবিকা নদীকূলে রাখিয়া প্রস্থান করিল। কমিশনরের পত্নী ভয়-বিহ্বল চিত্তে সমস্ত রাত্রি সেই তুন্দুরের ভিতর লুক্কায়িত রহিলেন। রাত্রিকালে সিপাহিরা উক্ত গ্রামে প্রবেশ করিয়া চারি দিকে পলায়িত ইংরেজ পুরুষ ও স্ত্রীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল, এবং পলায়িত ও আশ্রিত দিগকে বাহির করিয়া না দিলে প্রাণসংহার করা হইবে বলিয়া সকলকে ভয় দেখাইতে লাগিল। আপনার জীবন হানির সম্ভাবনা জানিয়াও কোমল-হৃদয়া আশ্রয়-দাত্রী নিরাশ্রয়া ইংরেজ-মহিলাকে নরশোণিত লোলুপ সিপাহি দিগের সম্মুখে উপস্থিত করিল না। যখন ঐ ইংরেজ মহিলা গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করেন, তখন গ্রামীন পুরুষেরা কৃষি কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল, সুতরাং তাহাদের অনেকে এই বিষয় অবগত ছিল না। কিন্তু গ্রাম-বাসিনী অধিকাংশ মহিলাই এই নিগূঢ় তত্ত্ব জানিত, তথাপি তাহাদের কেহই ইহা প্রকাশ করিল না। ভয়-ব্যাকুলা বিদেশিনী দরিদ্র আশ্রয়দাত্রীর অনুগ্রহে তুন্দুরের অভ্যন্তরে নীরবে সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন। ক্রমে ভয়াবহ কোলাহল নিবৃত্ত হইল, সিপাহিগণ স্থানান্তরে চলিয়া গেল। ভয়ঙ্করী রাত্রি প্রভাত হইলে ডেপুটী কমিশনরের পূর্ব্বোক্ত বিশ্বস্ত ভৃত্য সেই স্থানের অতি সমৃদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী মহারাজ মানসিংহের নিকট যাইয়া এক খানি নৌকা প্রার্থনা করিল। দয়ার্দ্র মানসিংহ বিপন্নের উদ্ধারার্থ ভৃত্যের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। ডেপুটী কমিশনরের পত্নী ও অপর কয়েকটী ইউরোপীয় মহিলা আপনাদের সন্তান-বর্গের সহিত নৌকায়

অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। বাহিরে সমভিব্যাহারী কতিপয় বিশ্বস্ত ভৃত্য ও সিপাহি বসিয়া রহিল, এবং এখানি তীর্থ-যাত্রীর নৌকা বলিয়া সাধারণের নিকট ভাণ করিতে লাগিল। দুই এক স্থানে ইঁহাদের সহিত বিদ্রোহী সিপাহিদিগের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কিন্তু নৌকার অভ্যন্তরে পলাতক ইউরোপীয় আছে, ইহা বিদ্রোহিগণ বুঝিতে পারে নাই। সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে নৌকা কোন নিরাপদ স্থানে লাগাইয়া কয়েকজন ভৃত্য দুগ্ধ ও রুটির জন্য নিকটবর্ত্তী পল্লীতে গমন করিল। এ স্থানেও পল্লী-বাসিনীগণ বিপন্ন পলাতকদিগকে সাহায্যদানে কাতর হইল না। একটী দয়াবতী রমণী শিশু গুলিকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া দ্রুত-গতিতে গ্রামে প্রবেশ করিল এবং কয়েকজন দুগ্ধবতী ধাত্রী সঙ্গে করিয়া নৌকার নিকটে উপস্থিত হইল। ইউরোপীয় মহিলাগণ আহ্লাদ-সহকারে ইঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন; ইঁহারা আপনাদের স্তন্য-দানে শিশুদিগকে পরিতৃপ্ত করিল। সিপাহিগণ জানিতে পারিলে এই আশ্রয়-দাত্রী ও সাহায্য-কারিণী মহিলাদিগের প্রাণ সংহার করিত। আপনাদের জীবন এই রূপ সংশয়াপন্ন করিয়াও উক্ত দয়াবতী রমণীগণ বিপন্নদিগের যথাসাধ্য সাহায্য করে। এই রূপ সাহায্য পাইয়া ইউরোপীয় কুলকামিনীগণ নিরাপদে এলাহাবাদে উপনীত হন। ডেপুটী কমিশনার ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী এই মহদুপকার বিস্মৃত হন নাই। যুদ্ধের অবসান হইলে ইঁহারা উক্ত সদাশয়া মহিলাদিগকে যথোচিত পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।

আর একজন ভারত-মহিলা সিপাহি-যুদ্ধের সময় অবিচলিত বিশ্বাস, অটল সাহস ও অসামান্য প্রভু-পরায়ণতার পরিচয় দেয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে এই মহিলা অযোধ্যায় এক জন ইংরেজ সেনাপতির

পরিবার-মধ্যে ধাত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। সেনাপতি আপনার স্ত্রী ও সন্তানদিগকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছিলেন, কেবল একটী কুড়ি মাসের শিশু তাঁহার নিকটে ছিল। যুদ্ধের সময় উক্ত ধাত্রীর প্রতি এই শিশুটীর প্রতিপালন-ভার সমর্পিত হয়। একদা প্রাতঃকালে ধাত্রী প্রচলিত রীতি-অনুসারে শিশুটীকে লইয়া ভ্রমণ করিতেছে, এমন সময়ে চারিদিকে বিদ্রোহিদিগের ভয়ঙ্কর কলরব শুনিতে পাইল। কোলাহল শ্রবণে সে বিদ্রোহিদিগের দৃষ্টি পরিহার করিয়া, দ্রুতবেগে গৃহে আসিয়া শুনিল, সিপাহিগণ সম্পত্তি লুঠিয়া লইতেছে এবং ইউরোপীয় বালক, বৃদ্ধ বনিতা সকলকেই মৃত্যু-মুখে পাতিত করিতেছে। সেহময়ী ধাত্রী শিশুটীকে স্থানান্তরে প্রচ্ছন্ন রাখিবার আর সময় পাইল না। অপরিষ্কার বস্ত্রে তাড়াতাড়ি তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করিয়া গৃহের এক প্রান্তে চাপিয়া রাখিল, এবং সাহসে ভর করিয়া তাহার সম্মুখে বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সিপাহিরা সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া ধাত্রীকে কহিল 'আমরা বিদেশীয় যুবক, বৃদ্ধ সকলকেই বধ করিব, শিশুটী কোথায় আছে, শীঘ্র বাহির করিয়া দাও।' ধাত্রী শিশুর সম্বন্ধে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না; কেবল নিজের সম্বন্ধে দয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল। সিপাহিগণ এই প্রার্থনায় সম্মত হইল না, কহিল বালকটীকে বাহির করিয়া না দিলে নিশ্চয়ই তোমাকে দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে। অসহায় ও বিপন্ন সন্তান ধাত্রীর পশ্চাদ্ভাগে বস্ত্রাচ্ছাদিত ছিল। ধাত্রী ইচ্ছা করিলেই তাহাকে সিপাহিদের হস্তে সমর্পণ করিয়া আপনাকে আসন্ন বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে পারিত। কিন্তু অনুপম হিতৈষিতা তাহাকে এই নৃশংস কার্য্য হইতে বিরত করিল। ধাত্রী শিশুর সম্বন্ধে কোন কথা কহিল না, কেবল পূর্ব্বের ন্যায় আপনার জন্য করুণা প্রার্থনা করিতে লাগিল।

এক জন সিপাহি বিজাতীয় বিদ্বেষে ধাত্রীকে নিরস্ত্র দেখিয়া সক্রোধে তাহার বাহুতে তরবারির আঘাত করিল, আহত স্থান হইতে অনর্গল রক্তধারা নির্গত হইতে লাগিল। ধাত্রী নীরবে এই আঘাত সহ্য করিল; অসহায় বালক কোথায় আছে, কহিল না। ঘাতকের উত্তোলিত অসি উপর্য্যুপরি তাহার দেহে পতিত হইতে লাগিল; অসহায় অবলা কেবল আপনার বাহু দ্বারা তরবারির নিদারুণ আঘাত হইতে মস্তক রক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে তাহার সমস্ত দেহ ক্ষত বিক্ষত ও রুধিরে প্লাবিত হইয়া উঠিল, অবলা আর সহিতে পারিল না; হতচৈতন্য হইয়া ভূমিতে পড়িল। এ দিকে সিপাহিরা লুণ্ঠনাশয়ে স্থানান্তরে প্রস্থান করিল; স্নেহময়ী ধাত্রীর প্রাণাধিক স্নেহের ধন রক্ষাকারিণীর পার্শ্বে নিরাপদে বস্ত্রাচ্ছাদিত রহিল।

ধাত্রী সংজ্ঞালাভ করিয়া, শিশুটীকে লইয়া আপনার বাটীতে উপস্থিত হইল, এবং লোকে ইংরেজ বালক বলিয়া মনে করিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে উহার গাত্রে এক প্রকার রং মাখাইয়া দিল। কিছু দিন পরে সে জানিতে পারিল, তাহার প্রভু ও প্রভু-পত্নী উভয়ই লাক্ষ্ণৌ নগরে আছেন। এই সংবাদ শুনিয়া বিশ্বাসিনী পরিচারিকা, শিশুটীকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল, এবং প্রীতি-প্রফুল্ল হৃদয়ে প্রভু ও প্রভু-পত্নীর হস্তে তাঁহাদের হৃদয়-রঞ্জন স্নেহের পুত্তলী অর্পণ করিল। কর্ণেল ও তাঁহার বনিতা আহ্লাদ ও কৃতজ্ঞতার সহিত শিশুটীকে গ্রহণ পূর্ব্বক শান্তি স্থাপিত হইলে ধাত্রীকে সমুচিত পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

আহত স্থান আরাম হলে তখন [illegible] ধাত্রী লক্ষ্ণৌ হইতে আপনার বাস-গ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হয়। যত দিন সিপাহিরা লক্ষ্ণৌ অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিল, তত দিন সে এই স্থানেই

অযোধ্যার সিপাহিগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। ডাক্তার কার্য্যানুরোধে স্বয়ং পলাইতে পারিলেন না; কেবল তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে তিনটী শিশু সন্তানের সহিত অবিলম্বে লক্ষ্ণৌয়ো-[illegible] যাইতে পরামর্শ দিলেন। চিকিৎসক-পত্নী সম্মুখে যাহা পাইলেন, তৎসমুদয় তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠাইয়া, সন্তান ত্রয়ের সহিত লক্ষ্ণৌ নগরের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এ দিকে ডাক্তার, অপরাপর ইংরেজেরা যেখানে আত্মরক্ষার্থ অবস্থিত ছিলেন, সেই স্থানে উপনীত হইলেন। চারি দিকে সিপাহিদিগের ভীষণ কোলাহল সমুত্থিত হইল, ইউরোপীয়দিগের অধ্যুষিত গৃহ সকল দগ্ধ হইতে লাগিল, গভীর নিশীথে ভয়ঙ্কর অনলশিখা দ্বিগুণ উজ্জ্বলভাব ধারণ করিল। চিকিৎসক-পত্নী তিনটী সন্তান ও দুটী বিশ্বস্ত ভৃত্যের সহিত সভয় হৃদয়ে এই ভয়ঙ্কর সময়ে রাজপথ অতিবাহন করিয়া লক্ষ্ণৌ গমন করিলেন। চিকিৎসক দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন; কিন্তু আর গৃহে গমন করিলেন না, অন্যান্য ইউরোপীয়দিগের সহিত সিপাহিদিগের আক্রমণ নিরস্ত করিতে প্রস্তুত হইলেন।

এ দিকে বামনী প্রভুর পরিত্যক্ত গৃহে নিশ্চেষ্ট ছিল না। তাহার প্রভুপত্নী যে স্থানে অলঙ্কারাদি বহুমূল্য সম্পত্তি রাখিতেন, তাহা সে অবগত ছিল, এক্ষণে কালবিলম্ব না করিয়া, সেই সমস্ত মূল্যবান্ আভরণাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইল। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে সিপাহিগণ আসিয়া সেই গৃহে অগ্নি প্রদান করিল। চিকিৎসক দূর হইতে দেখিলেন, তাঁহার গৃহ করাল অনল-শিখায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। বামনী যে, সমস্ত অলঙ্কার লইয়া প্রস্থান করিয়াছে, তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। সুতরাং সে ইচ্ছা করিলেই এই সমস্ত মহামূল্য দ্রব্য আত্মসাৎ করিতে পারিত। আভরণগুলি বিক্রয় করিলে যে টাকা লাভ হইত, তাহা বামনী

দেখিলেন, কামিনী তাঁহাদের পরিচ্ছদাদি ও অলঙ্কার আদি লইয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাঁহাদের বিস্ময় ও আনন্দের অবধি রহিল না। দরিদ্র পরিচারিকা কৃতজ্ঞ ভাবে একে একে সমস্ত অলঙ্কার বুঝাইয়া দিল। মিঃ বিংসন ও তাঁহার স্ত্রী দেখিলেন, অলঙ্কারাদির কিছুই অপহৃত হয় নাই। তাঁহারা পরিচারিকার এই অসাধারণ সাধুতার পুরস্কার স্বরূপ, দ্বিগুণ বেতনে পুনরায় তাহাকে কর্মে নিযুক্ত করিলেন। কামিনী এইরূপে প্রভু-পরিবারের বিশ্বাস-ভাজন হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

সিপাহি যুদ্ধের সময় কেবল নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরাই প্রভু-ভক্তির পরিচয় দিয়াছে, তাহা নহে। সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহিলাগণও আপনাদের স্বভাব-সিদ্ধ সাধুতা ও উদারতার বশবর্তী হইয়া অসহায় ইউরোপীয়দিগকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। বুঁদীর রাজার ধর্মপরায়ণা বনিতা এই শ্রেণীর রমণীগণের অগ্রগণ্য। বুঁদী-রাজ সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এ দিকে তাঁহার ধর্মশীলা পত্নী শুনিতে পাইলেন, ইউরোপীয়গণ দলে দলে নিহত হইতেছে; যে সকল কুলকন্যা ও শিশু সন্তানগণ এক সময়ে সুখ সৌভাগ্যের ক্রোড়ে লালিত হইয়াছিল, তাহারা এক্ষণে খাদ্যবিহীন ও বস্ত্রবিহীন হইয়া আশ্রয়-স্থানের অভাবে দিবসের প্রচণ্ড রৌদ্র ও রাত্রির দুরন্ত হিমের মধ্যে নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে পড়িয়া রহিয়াছে। এই শোচনীয় দুর্গতির সংবাদে কামিনীর কোমল হৃদয় দয়ার্দ্র হইল। বুঁদীর অধিশ্বরী স্বামীর অজ্ঞাতসারে বিশ্বস্ত লোক দ্বারা নিকটবর্ত্তী অরণ্যস্থিত নিরাশ্রয় ইউরোপীয়দিগের নিকট আহার্য্য ও পরিধেয় পাঠাইতে লাগিলেন। এই

অভিভাবক ছিল ; দুঃখিনী ধাত্রী শিশুটীকে তাহার জন্মাবধি প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছিল। সুতরাং তাহাকে সে প্রাণের অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিত। পিতৃ-মাতৃ-হীন দুঃখী সন্তান কেবল এই দুঃখিনী নারীর অনুপম স্নেহে রক্ষিত হইতেছিল।

ক্রমে কানপুরের অবরোধ-কার্য্য শেষ হইয়া আসিল। সিপাহি-দিগকে প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া, জুন মাসের শেষে ইংরেজ সেনাপতি এই নিয়মে নানা সাহেবের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন যে, ইউরোপীয় মহিলা ও বালক বালিকাদিগের সহিত তাঁহার সৈন্যগণ নৌকারোহণে স্থানান্তরে গমন করিবে ; সিপা-হিরা তাহাদের কোন বিঘ্ন জন্মাইবে না। নানা সাহেব ইহাতে সম্মত হইলেন। অবরুদ্ধ কামিনীগণ বিমুক্তির সংবাদে [illegible] হইয়া নৌকায় আরোহণ করিবার জন্য সজ্জিত হইতে [illegible]

ফিরিঙ্গী-সন্তানের প্রতিপালিকা ধাত্রীও পরিত্রাণ [illegible] ছুটিতে শিশুটীকে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক আপনার [illegible] নব-বয়স্ক পুত্রকে সঙ্গে করিয়া নদীকূলে গমন করিল। সকলে নৌকায় আরোহণ করিয়াছে, এমন সময়ে সিপাহিরা তট-দেশ হইতে আরোহিদিগকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুঁড়িতে লাগিল। দুটী কামান নদীতটে লুকায়িত ছিল, একণে তাহা বাহির করিয়া নৌকার সম্মুখবর্ত্তী করা হইল। ধাত্রী উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শিশু সন্তানটীকে বক্ষঃস্থলে চাপিয়া রাখিয়া, পুত্রের সমভিব্যাহারে সিঁড়িতে নামিল, এবং ঐ সিঁড়ি দিয়া সবেগে তীরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ভীষণ কামান ধ্বনি ও কৃতান্ত-সহচর সিপাহিদিগের কলরব-মধ্যে অসহায় রমণী দুটী সন্তানকে লইয়া, প্রাণভয়ে তটদেশ লক্ষ্য করিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিল, কিন্তু দুঃখিনী পরিত্রাণ পাইল না। তীরে সিপাহি-গণ নিষ্কোশিত অসি হস্তে দণ্ডায়মান ছিল। ধাত্রী সেই তট

সেথা উপনীত হইয়াছিল, অমনি তাহাদের এক জন দক্ষিণ হস্তে অসি উত্তোলন করিয়া, ফিরিঙ্গী সন্তানকে ধরিবার জন্য বাম হস্ত প্রসারণ করিল। স্নেহময়ী ধাত্রী ক্ষুদ্র বালকের হস্তে শিশুটীকে সমর্পণ করিলনা; নিজের অঙ্গ আচ্ছাদন দ্বারা তাহাকে দৃঢ়রূপে জড়াইয়া বাহুদেশ মধ্যে চাপিয়া রাখিল।

নরহন্তা সিপাহি অসি আস্ফালন করিয়া তীব্র ভাবে কহিল:

"বালকটীকে হাতে দাও। তোমার শরীর অক্ষত থাকিবে।"

তেজস্বিনী ধাত্রী গম্ভীর স্বরে উত্তর করিল, "আমি কখনই আমার সন্তানকে তোমার হাতে দিব না। ঈশ্বরের করুণা স্মরণ করিয়া আমাদের উভয়কেই দয়া কর।"

"বালককে সমর্পণ না করিলে দয়ার প্রত্যাশা নাই।" সিপাহি সরোষে ইহা কহিয়া পুনর্ব্বার হস্ত প্রসারণ করিল। কিন্তু ধাত্রী দৃঢ় রূপে জড়াইয়া ধরিয়াছিল, ছাড়িয়া দিল না,

ধাত্রীর পঞ্চদশ বর্ষীয় পুত্র নিকটেই ছিল। সে কাতর স্বরে কহিল; "মা! শিশুটীকে দিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা কর।

পুত্রের কাতর প্রার্থনায় দয়াবতী রমণী আপনার প্রতিজ্ঞা হইতে স্খলিত হইল না। নির্ভয়ে অটল সাহসে উত্তর করিল; "না তাহা কখনই হইবে না।"

এই কথা বলিবা মাত্র ঘাতকের উত্তোলিত অসি সবেগে তাহার মস্তকে নিপতিত হইল, দারুণ আঘাতে মস্তক বিদীর্ণ হইয়া গেল। ধাত্রী অচৈতন্য হইয়া ধরাশায়িনী হইল। আর তাহার চৈতন্য হইল না। অভাগিনী অবন্ধু পিতৃ-মাতৃহীন শিশুর জন্য কাতরে বীরভাবে আত্ম-প্রাণ বিসর্জ্জন করিল।

নিষ্ঠুর সিপাহি ফিরিঙ্গী শিশুটীকে বধ করিল। একমাত্র ধাত্রী-পুত্রের প্রাণ রক্ষা পাইল। সিপাহি তাহার প্রতি কোন অত্যাচার করিলনা।

এই ঘটনার চারি বৎসর পরে পূর্ব্বোক্ত ধাত্রীর পুত্র অযোধ্যায় উপনীত হয়। জননীর মৃত্যুর প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে সে কাঁদিত, "মা আমার কথা শুনিলে প্রাণ রক্ষা করিতে পারিতেন, তিনি শিশুকে বাঁচাইতে গিয়া উভয়েই হত হইলেন"।

উল্লিখিত ঘটনাগুলি উদারতা, সাধুতা, ও নিঃস্বার্থ হিতৈষিতার প্রধান পরিচয়-স্থল। ভারতের অবলাগণ এক সময়ে এই উদারতা, সাধুতা ও হিতৈষিতা দেখাইয়া পৃথিবীতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। অনেক পুরুষ ইঁহাদের ন্যায় এই রূপ দেব-ভাবের পরিচয় দিতে পারেন নাই। যাঁহারা পরোপকারের জন্য আত্ম-প্রাণ উৎসর্গ করেন, তাঁহাদের সহিত কোন পার্থিব পদার্থের তুলনা হয় না। ভারত-মহিলার এই সুমধুর দেব-প্রকৃতি পৃথিবীর স্ত্রী পুরুষ সকলেরই হৃদয়-ফলকে অঙ্কিত রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য।

ভূমিকম্প ও তাহার উপকারিতা।

পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, পৃথিবী এক সময়ে প্রজ্বলিত পিণ্ড স্বরূপ ছিল। কালক্রমে তাহার পৃষ্ঠদেশ শীতল হইয়া জীব জন্তুর আবাসযোগ্য হইয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর অন্তর্ভাগ আজ পর্য্যন্ত শীতল হয় নাই। প্রচণ্ড অগ্নির উত্তাপে পূর্ব্বের ন্যায় প্রজ্বলিত অবস্থায় আছে। এই প্রজ্বলিত পদার্থে বা তাহার নিকটবর্ত্তী উত্তপ্ত প্রস্তর ও মৃত্তিকায় কোন প্রকারে জল লাগিলে বাষ্প জন্মে। এই বাষ্পের প্রসারণ শক্তি-বলে ভূমি-

যায়। এতদ্ব্যতীত লাইমা প্রভৃতি অনেকগুলি নগর ভূমিকম্প দ্বারা অনেক বার উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে।

ভূমিকম্পে কেবল গৃহাদি বিনষ্ট হয় না, ভূভাগও অনেক অংশে রূপান্তরিত হইয়া যায়। পৃথিবী স্থানে স্থানে স্ফুটিত হয়। এই স্ফুটিত স্থান হইতে জল, কর্দ্দম, বাষ্প, ধূম, বালু শিলাদি অতি দূরে উৎক্ষিপ্ত হয়, প্রাচীন জলোৎস সকল বিলুপ্ত হয়, নূতন স্থান হইতে উৎস নির্গত হয়, কোন স্থান বসিয়া যায় এবং কোন স্থান উন্নত হইয়া উঠে। কথিত আছে, ক্যালাব্রিয়া দেশে যে ভূকম্প হয়, তাহাতে কতিপয় ক্ষুদ্র পর্ব্বত স্থানান্তরিত হইয়াছিল। পঞ্চবিংশতি বৎসরের মধ্যে চিলি দেশের ভূমিকম্পে সমুদ্র-তটের অবস্থা পুনঃপুনঃ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ১৮২২ অব্দে ঐ দেশের বালপারাইসো নগরের ২০ ক্রোশ ভূমি দুই হস্ত ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তাহার তিন বৎসর পরে সেণ্টমারিয়া দ্বীপ জল-সীমা হইতে ৯ হস্ত ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, এবং তাহার চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী জলের গভীরতা হ্রাস হইয়া যায়।

পূর্ব্বে সিন্ধুনদের শাখায় এক ফুট পরিমিত জল থাকিত। কয়েক বৎসর হইল, কচ্ছ দেশে যে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়, তাহাতে ঐ নদীর গর্ভ বিংশতি ফীট নিম্ন হয়, সুতরাং সেই অবধি তথাকার জল একবিংশতি ফীট গভীর হইয়াছে। এই ভূকম্পে ভুজ নগর ও তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী ভূমি নিম্ন হইয়া 'রণ' নামক হ্রদে পরিণত হয়। সিন্ধুরী নামক দুর্গ ও গ্রাম বসিয়া যায়, এবং তাহাতে জল প্রবেশ করে। সিন্ধুরীর দুর্গের উপরিভাগ জলে মগ্ন হয় না, তাহাতে অনেকে উঠিয়া প্রাণ রক্ষা করে। সিন্ধুরী হইতে অনূ্যন ৫ মাইল দূরে ৫০ মাইল দীর্ঘ, ১৬ মাইল প্রশস্ত ও পার্শ্বভূমি হইতে ১০ ফীট উচ্চ একটী পাহাড় উৎপন্ন হয়। ঈশ্বর-কৃ৹

য়াছেন। প্রথম, উৎক্ষিপ্ত কম্পন; এই কম্পনে বোধ হয় যেন ভূমি ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। রিওবাম্বা নগর এই উৎক্ষিপ্ত কম্পনে বিনষ্ট হয়। ইহাতে পর্ব্বত-পাদদেশস্থিত গ্রামের মনুষ্য পশ্বাদি পর্ব্বতের উপর উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয় ঊর্ম্মিবৎ কম্পন প্রবাহিত কম্পনে ভূমি জলতরঙ্গের ন্যায় কম্পিত হয়। সাধারণ ভূকম্প এই প্রকারই হইয়া থাকে। তৃতীয় ঘূর্ণিত বা অর্দ্ধ ঘূর্ণিত কম্পন। এই কম্পন অত্যন্ত ভয়ানক। এতদ্দ্বারা ক্ষেত্রাদি স্থানান্তরিত হইয়া যায়। লিস্‌বন ও ক্যালাব্রিয়ার ভূমিকম্প এই শেষোক্ত প্রকারের হইয়াছিল।

ভূকম্পন অল্পক্ষণ স্থায়ী। বিশেষতঃ ভূমিকম্প যত প্রবল হয়, তাহার স্থিতি ততই অল্প হইয়া থাকে। প্রবল ভূকম্পন এক মিনিটের মধ্যেই নিরস্ত হয়। কারাকাস্ নগরে যে ভীষণ ভূমিকম্প হয়, তাহা দুই পল মাত্র ছিল। এই দুই পলের মধ্যে তিন বার কম্পন হয়। কোন কোন স্থলে ভূমি অল্প অল্প কাঁপিয়া পরিশেষে প্রবল বেগে কম্পিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভীষণ ভূমিকম্প একবারেই হইয়া থাকে, তাহার পূর্ব্বে আর কোন রূপ অল্প কম্পন হয় না।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ভূমিকম্প-সময়ে ভূগর্ভ হইতে মেঘ গর্জ্জনবৎ অথবা দূরাগত কামান-ধ্বনির ন্যায় গভীর শব্দ সমুত্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু সকল ভূমিকম্পেই এই রূপ শব্দ শ্রুত হয় না। যে কম্পনে রিওবাম্বা নগর উৎসন্ন হইয়া যায়, তাহার সময়ে কোন রূপ শব্দ কর্ণগোচর হয় নাই। কোন কোন সময়ে পৃথ্বীগর্ভ হইতে ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হয়, অথচ সে সময়ে কোন ভূকম্প অনুভূত হয় না। ভূমিকম্পের অনেক পূর্ব্ব-সূচনা হইয়া থাকে। বায়ু সহসা প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়, অথবা নিস্তব্ধ-ভাব ধারণ করে, অতি বৃষ্টি হইতে থাকে, দিঙ্মণ্ডল

কুজ্ঝটিকাবৃত ও সূর্য্য অজ্ঞাত হয়, ভূমি হইতে বাষ্পবিশেষ নির্গত হয়, এবং মনুষ্যের বমনেচ্ছা জন্মিয়া থাকে।

ভূমিকম্পের সংহারিণী শক্তি থাকিলেও উহা দ্বারা পৃথ্বী-মণ্ডলের অনেক উপকার সাধিত হয়। জল ভূমির পরম শত্রু; জলের সংহারিকা শক্তির প্রভাবে ভূমি নিয়তই ক্ষয়িত হইতেছে। দ্বিবিধ প্রকারে জলের এই সংহারিকা শক্তির কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হয়। এক, সমুদ্রের জল ক্রমাগত উপকূলভাগ আঘাত করিয়া উহা ক্রমশঃ ক্ষয় করিতে থাকে। জলের এই সংহারক কার্য্যের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর সকল স্থান হইতেই সংগ্রহ করা যাইতে পারে। সমুদ্রের উপদ্রবে এক্ষণে সুন্দর বন ক্রমশঃই অন্তর্হিত হইতেছে। আমাদের দেশের পদ্মা নদী দ্বারা যে অনেক জনপদ উৎসন্ন হইয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। শেটলণ্ড দ্বীপশ্রেণী কঠিন প্রস্তরময় পদার্থে নির্ম্মিত। সমুদ্রের অত্যাশ্চর্য্য শক্তি প্রভাবে, এই দ্বীপের বৃহদাকার প্রস্তর খণ্ড দূরে অপসারিত ও গিরিশৃঙ্গে সুগভীর গহ্বর সমুৎপন্ন হইয়াছে। এই উপদ্রবে ইংলণ্ডের পশ্চিম উপকূলস্থিত অনেক প্রাচীন সমৃদ্ধ স্থানও সাগর-গর্ভে বিলীন হইতেছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই সংহার-ব্যাপার নিয়ত সংঘটিত হইতেছে। জল দ্বারা পৃথিবীর যে প্রভূত অংশ বিনষ্ট হয়, তাহার অত্যল্পভাগ মাত্র একত্রিত হইয়া চর রূপে পরিণত হইয়া থাকে। জল-প্রবাহে পৃথিবী যতই ক্ষয়িত হয়, ততই এই রূপ চরের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সুতরাং এই সকল চরের পরিমাণ-বৃদ্ধিও জলের সংহারকতার একটী দেদীপ্যমান প্রমাণ। কিন্তু ভূমির নিয়ত যে ক্ষতি হইতেছে, এই সকল দ্বারা সেই ক্ষতির পূরণ হয় না। এক স্থানের মৃত্তিকাই স্থানান্তরে অপসারিত হইয়া চরের উৎপত্তি করে, সুতরাং চর ভূভাগ বৃদ্ধির কারণ নহে. উহা কেবল ভূমির স্থানান্তরে অপসরণ মাত্র।

অধিকন্তু যে সময়ের মধ্যে জল-ধৌত মৃত্তিকারাশি জমিয়া চর উৎপন্ন হয়, সেই সময়ের মধ্যেই আবার জল-প্রবাহে পৃথিবীর অধিকাংশ ক্ষয়িত হইয়া যায়। সুতরাং স্থানে স্থানে চরের উৎপত্তি হইলেও তরঙ্গ-বেগে পৃথ্বী-গাত্রের বহু পরিমাণে ক্ষতি হইয়া থাকে।

জলের সংহারিকা শক্তির দ্বিতীয় প্রকার বৃষ্টি। সমুদ্রে অথবা নদীর তরঙ্গ-মালার অভিঘাত প্রতিঘাতে যে ক্ষতি হয়, তাহা কেবল তট-দেশেই সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। তটদেশ ভিন্ন অন্য কোথাও সমুদ্র অথবা নদীর উপদ্রব দৃষ্ট হয় না। যে স্থানে সমুদ্র অথবা নদী-তরঙ্গের প্রসর নাই, সে স্থানে বৃষ্টির জলে ভূমি ক্ষয়িত হইয়া যায়। সমুদ্র হইতে বাষ্প উত্থিত হইয়া পৃথিবীর নানা স্থানে বৃষ্টি রূপে পতিত হইতেছে, এই বৃষ্টির দ্বারা সেই সেই স্থানের ভূমিও নিয়ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। ভূমি-ক্ষয়ের যতগুলি কারণ আছে, তাহার মধ্যে ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এই বৃষ্টির জলকেই সর্ব্ব প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৃষ্টির জল নদী, উপনদী প্রভৃতি পথ দিয়া সমুদ্রে পতিত হয়। এই সমুদ্র হইতে বাষ্প উত্থিত হইয়া আবার বৃষ্টির উৎপত্তি হয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই প্রক্রিয়া অবিশ্রান্ত চলিতেছে, সুতরাং অবিশ্রান্ত পৃথ্বী দেহেরও ক্ষয় সাধিত হইতেছে। স্যার চার্লস্ লায়াল নামক এক জন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত কোন দেশের একটী প্রদেশের অধিকাংশ বৃষ্টির জলে ক্ষয়িত হইতে দেখিয়াছিলেন। এই রূপে এক সমুদ্রই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপকূল দেশকে ও পরম্পরা সম্বন্ধে দেশের অভ্যন্তরভাগকে ক্রমাগত ধ্বংস করিতেছে।

এই সংহারিকা শক্তির প্রতিরোধ জন্য প্রকৃতির কোন উদ্ধারিকা শক্তি থাকা বিশেষ আবশ্যক। ভূমিকম্পই এই

উদ্ধারিকা-শক্তি। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ভূকম্প-প্রভাবে পৃথ্বী গাত্রের কোন স্থান উন্নত এবং কোন স্থান অবনত হইয়া যায়। জল ক্রমাগত পৃথিবীর চারিদিক সমান রূপে ক্ষয় করিয়া পৃথ্বীদেহ বিশুদ্ধ গোল করিয়া তুলিতেছে, বস্তুতঃ বিশুদ্ধ রূপে [illegible]কার করাই জলের এক মাত্র কার্য্য। একণে পৃথিবীর স্থান বিশেষ উন্নতাবনত হইলে জলের আর তাদৃশ সংহারিণী শক্তি থাকে না। কারণ কোন ভূভাগ নিম্নতর হইয়া পড়িলে জলও উহার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নে পড়িয়া যায়, সুতরাং নিম্নস্থ জল উচ্চতর ভূভাগকে সহসা আক্রমণ করিতে পারে না। পৃথিবীর যে অংশে সমুদ্রের অত্যাচার অধিক, প্রকৃতির অদ্ভুত নিয়ম-বলে সেই অংশে প্রবল ভূমিকম্প অধিক পরিমাণে সংঘটিত হইয়া থাকে। সমুদ্রের সন্নিকটবর্ত্তী স্থানেই ভূমিকম্প ও আগ্নেয় গিরির উৎপাত দৃষ্ট হয়। ফলে সমুদ্রের সংহারিকা শক্তি যেমন সহস্র রসনা[illegible] পৃথ্বীতল আক্রমণ করিতেছে, ভূমিকম্প-রূপ প্রকৃতির উদ্ধারিকা শক্তিও তেমনই সেই আক্রমণে বাধা দিয়া পৃথিবীর দেহ [illegible] করিতে যত্ন করিতেছে। ভূমিকম্পের ন্যায় কোন উদ্ধারিকা শক্তি না থাকিলে পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকিত না। বিজ্ঞান-বিশারদ সার জন হর্শেল কহিয়াছেন, যদি পৃথিবী সৃষ্টির সময়ে যে ভাবে ছিল, চিরকাল সেই ভাবে থাকিত, যদি কোন প্রকারে উহার পরিবর্ত্ত না হইত, তাহাহইলে সংহারিকা শক্তির কার্য্যবশতঃ এত দিনে পৃথিবীর চিহ্ন মাত্রও থাকিত না। বস্তুতঃ ভূকম্প-বলে পৃথ্বীতল পরিবর্ত্তিত হয় বলিয়াই উহা অক্ষুণ্ণ ভাবে রহিয়াছে; নতুবা সমস্ত ভূভাগই অনন্ত-বিস্তৃত বারিরাশির গর্ভে বিলীন হইয়া যাইত।

সংযুক্তা

সংযুক্তা কান্যকুব্জপতি জয়চন্দ্রের দুহিতা।* ১১৭০ খৃঃ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। সুপ্রসিদ্ধ চাঁদ কবি চৌহানরাসোর কানোজখণ্ডে ইঁহার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। সংযুক্তা তৎকালিক মহিলাদিগের আদর্শস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার কেবল অনুপম সৌন্দর্য্য ছিল না; অসাধারণ উদারতাও ছিল। সংযুক্তার গুণগরিমা এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে, চাঁদ তাঁহাকে কান্যকুব্জের লক্ষ্মী বলিয়া বর্ণনা করিতে ত্রুটী করেন নাই।

জয়চন্দ্র রাঠোর-বংশীয় রাজপুতদিগের এবং সুপ্রসিদ্ধ দিল্লীপতি পৃথ্বীরাজ চৌহান-বংশীয় রাজপুতদিগের প্রধান ছিলেন। এই রাঠোর ও চৌহান কুলের মধ্যে মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ ছিল। পৃথ্বীরাজ অতুল সৌভাগ্য-সম্পত্তির অধিকারী হইয়া একদা সুপ্রসিদ্ধ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান দেখিয়া তদীয় পরম শত্রু জয়চন্দ্রের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হয়। জয়চন্দ্র এতন্নিবন্ধন অমর্ষ-প্রদীপ্ত হইয়া স্বীয় গৌরব ও প্রাধান্য অপ্রতিহত করিবার জন্য অচিরাৎ রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন। এই শেষবার ক্ষত্রিয়-রাজধানীতে ক্ষত্রিয় রাজগণের অভীষ্ট মহাযজ্ঞ সম্পাদিত হয়। ভারতীয় রাজন্যশ্রেষ্ঠের মধ্যে সকলেই এই মহাযজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া কান্যকুব্জে আগমন করেন, কেবল দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ ও মিবারাধিপতি সমরসীর আগমন হয় না। ইঁহারা আপনাদের বর্ত্তমানে অন্য লোককে উক্ত মহাযজ্ঞ সম্পাদনের অযোগ্য বলিয়া নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করেন। জয়চন্দ্র এ জন্য অভিমানী হইয়া পৃথ্বীরাজ ও সমরসীর মূর্ত্তি নির-

---

* কেহ কেহ ইঁহাকে "সংযোগিতা" নামে নির্দ্দেশ করেন। অন্যত্র, "রাজাবলিতে" ইঁহার নাম "আনন্দমঞ্জরী" লিখিত আছে।

যথা প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে যথাক্রমে দ্বারবান্ ও স্থালী-পরিষ্কারকের পদে প্রতিষ্ঠাপিত করেন। এ দিকে আড়ম্বরের সহিত রাজসূয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। যজ্ঞান্তে কান্য-কুব্জ-লক্ষ্মী সংযুক্তার স্বয়ম্বরের উদ্যোগ হইতে থাকে। স্বয়ম্বর-প্রথা রমণীকুলের মনোমত বর নির্ব্বাচনের উৎকৃষ্ট উপায়। পূর্ব্বে এই স্বয়ম্বর সকলের সর্ব্বকার গুণ-গ্রামের অদ্বিতীয় পরিচয়স্থল ছিল। বর্ণনীয় সময়ে এই চিরন্তন রীতি আর্য্য সমাজ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। এই পদ্ধতির অনুবর্ত্তী হইয়া গুণ-গৌরব-শ্রেষ্ঠ বাহুবল-দৃপ্ত ক্ষত্রিয় রাজগণ একে একে কান্যকুব্জের স্বয়ম্বর-সভা সমলঙ্কৃত করিতে লাগিলেন। রাজগণের অধিবেশনের পর সংযুক্তা স্বয়ম্বরোচিত বেশভূষায় সাজ্জিত হইয়া কণ্ঠে বরমাল্য ধারণ পূর্ব্বক ধাত্রীর সহিত সভা-গৃহে সমাগত হইলেন।

যে গুণানুরাগ হৃদয়ে উদ্দীপ্ত হইয়া মানবী প্রকৃতিকে দেবভাবান্বিত করিয়া তুলে, তাহা কখন সামান্য বাহ্য আবরণে নিবারিত হয় না। সংযুক্তা ইহার পূর্ব্বেই পৃথ্বীরাজের অলোকসামান্য গুণ অলোকসামান্য সাহস ও অলোকসামান্য বীরত্বের বিবরণ শুনিয়া তৎপ্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে পিতার শত্রুতায় সে আসক্তি নিরাকৃত হইল না। তিনি সাহসের সহিত পৃথ্বীরাজকেই বরমাল্য দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সুশোভন সভামণ্ডপে সুসজ্জিত রাজগণের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল না; সংযুক্তা সকলকে অতিক্রম করিয়া পৃথ্বীরাজের দ্বারবান্স্থানীয় হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতির গলদেশে বরমাল্য সমর্পণ করিলেন। জয়চন্দ্র দুহিতার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব কার্য্যে ম্রিয়মান হইলেন, স্বয়ম্বরস্থলীয় রাজগণ তাদৃশ রূপ-গুণ-সম্পন্ন ললনারত্ন লাভে হতাশ হইয়া আপনাদিগকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। *

অবিলম্বে সংযুক্তার মাল্যার্পণ-সংবাদ দিল্লীশ্বরের শ্রুতিপ্রবিষ্ট

হইল। সংবাদ পাইবামাত্র তিনি সসৈন্যে কান্যকুব্জে আসিয়া সংযুক্তাকে পিতৃভবন হইতে হরণ করিলেন। জয়চন্দ্র কন্যা-রত্নের উদ্ধারার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা পাইলেন, কান্যকুব্জ হইতে দিল্লীর গন্তব্য পথে পাঁচদিন পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইল; কিন্তু পরিশেষে পৃথ্বীরাজের জয় লাভ হইল। জয়চন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক ক্ষুব্ধ-হৃদয়ে কান্যকুব্জে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইল *।

কেহ কেহ পৃথ্বীরাজ-কৃত সংযুক্তা-হরণ ঘটনা ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নিবেশিত করিয়াছেন। আবার কাহারও মতে ইহা উক্ত সময়ের পঞ্চদশ বৎসর পরে সংঘটিত হইয়াছিল †। যাহা হউক, পৃথ্বী-রাজ এই অসামান্য ললনারত্নের অধিকারী হইয়া অনুক্ষণ তৎসঙ্গে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন, সংযুক্তার অসাধারণ গুণে স্বর্গসুখও তাঁহার নিকট তুচ্ছ বোধ হইল। সংযুক্তা অল্প সময়ের মধ্যেই ভর্ত্তার প্রিয়-পাত্রী হইয়া উঠিলেন।

পৃথ্বীরাজ যখন এইরূপ অনন্যসাধারণ দাম্পত্য-প্রেমের ক্রোড়ে লালিত, সংযুক্তা যখন এই রূপ পতি-সোহাগিনী হইয়া সৌভাগ্য-দোলায় দোলায়মান, তখন দুরন্ত সাহেবুদ্দীন ঘোরী ভার

* কেহ কেহ কহেন, জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজের স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তিকে দ্বার-রক্ষকের পদে স্থাপিত করাতে পৃথ্বীরাজ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে কান্যকুব্জে আগমন পূর্ব্বক জয়চন্দ্রকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। এই সময়ে সংযুক্তা পৃথ্বীরাজকে দেখিয়া মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। ইহার পর সংযুক্তা পিতৃকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর করেন, তিনি পৃথ্বীরাজকেই বিবাহ করিবেন। পৃথ্বীরাজ লোকপরম্পরায় এই সংবাদ জানিয়া পুনর্ব্বার সসৈন্যে কান্যকুব্জে আসিয়া, সংযুক্তাকে স্বীয় রাজধানীতে আনয়ন করেন।

† আমাদের বিবেচনায় এই শেষোক্ত (১১৯০ খ্রীঃ অব্দ) সময়ই ঠিক। ১১৭০ খ্রীঃ অব্দে যখন সংযুক্তার জন্ম, তখন ১১৭৫ অব্দে কি প্রকারে তিনি স্বয়ম্বরা হইবেন? পঞ্চবর্ষীয়া বালিকা কখনও স্বয়ং পতি মনোনীত করিতে পারে না।

[illegible]ের দ্বারে উপস্থিত হইল। সংযুক্তা, আসন্ন শত্রুর ভীষণ কবল হইতে মাতৃভূমি রক্ষা করিতে যত্নপর হইলেন। কি রূপে যবন-সৈন্য বিধ্বস্ত হইবে, কি রূপে যবন-গ্রাস হইতে ভারতভূমি রক্ষা পাইবে, এই চিন্তাই এক্ষণে তাঁহার হৃদয়ে বিরাজ করিতে লাগিল। তিনি ভর্ত্তাকে চতুরঙ্গ সেনাদলের অধিনায়ক হইয়া শীঘ্রই রণক্ষেত্রে অবতরণ করিতে অনুরোধ করিলেন। সংযুক্তার যত্ন কেবল এই অনুরোধ মাত্রেই পর্য্যবসিত হইল না। তিনি সমস্ত যুদ্ধোপকরণ একত্র করিয়া গম্ভীরোন্নতস্বরে পৃথ্বীরাজকে কহিলেন,—“জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। আমরা অদ্য যে জীবনস্রোতে দেহ ভাসাইয়া পার্থিব সুখ উপভোগ করিতেছি, হয়ত কল্যই তাহা অনন্ত সাগরে বিলীন হইতে পারে। ঈদৃশ ক্ষণভঙ্গুর দেহের মমতায় আকৃষ্ট হইয়া স্বদেশ চিরশত্রু মুখে জলাঞ্জলি দেওয়া বিধেয় নহে। যিনি মহৎ কার্য্য সাধন করিতে গিয়া আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করেন, তিনি চিরকাল এই জগতে বর্ত্তমান থাকেন। আমি আশা করি, তুমি নিজের বিষয় না ভাবিয়া স্বজাতির দিকে মনোযোগী হইবে। তোমার করস্থিত শাণিত অসি শত্রুর দেহ দ্বিখণ্ড করুক, তোমার অশিক্ষিত তেজস্বী অশ্ব শত্রুর শোণিত-স্রোতে সন্তরণ করুক, তোমার চতুরঙ্গ সৈন্যদল “জয় জয়” ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করুক। এই মহৎ কার্য্যে মৃত্যুকে ভয় করিও না, রণস্থল-বর্ত্তিনী করাল সংহার-মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত বা কর্ত্তব্য-বিমুখ হইও না। সাহস, উদ্যম ও যত্নের সহিত স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা কর, আমি পরলোকে তোমার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইব।” বীরবালা বীরজায়ার মুখ হইতে এই রূপ তেজোগর্ভ বাক্য নির্গত হইয়াছিল, এই রূপ তেজস্বিতা পৃথ্বীরাজের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল।

অবিলম্বে সৈন্যগণ সমবেত হইয়া যুদ্ধার্থ যাত্রা করিল। ভারতের প্রায় সমস্ত ক্ষত্র বীরগণ এই মহাযুদ্ধে শরীর ও মন উৎসর্গ করিলেন। আর্য্যবর্ত্তের রাজন্য-কুলের 'হর হর' ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক কম্পিত হইতে লাগিল। হিন্দু রাজ-চক্রবর্ত্তী পৃথ্বীরাজ এই সেনার অধিনায়ক হইয়া সাহেবুদ্দীনকে সমরে আহ্বান করিলেন। উত্তর ভারতের নারায়ণপুর গ্রামে (তিরৌরী-ক্ষেত্র) উভয় পক্ষে মহাসংগ্রাম হইল। যবন সৈন্য ক্ষত্রিয় বীরগণের দুর্ব্বার পরাক্রমে ইতস্ততঃ পলায়িতে লাগিল, শত্রুর পতাকা, শত্রুর অস্ত্র পৃথ্বীরাজের করগত হইল। সাহেবুদ্দীন ঘোরী পরাজিত হইয়া ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিল। পৃথ্বীরাজ বিজয়ী হইয়া মহোল্লাসে দিল্লীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

পরাজিত হইবার দুই বৎসর পরে সাহেবুদ্দীন আবার দলবল সহকারে ভারতবর্ষে উপনীত হইল। এ বারেও পৃথ্বীরাজ যুদ্ধার্থ সুসমৃদ্ধ আয়োজনে তৎপর হইলেন। অবিলম্বে সমরসংক্রান্ত সভা সংগঠিত হইল, নানা স্থান হইতে সৈন্যগণ সমবেত হইতে লাগিল, ক্ষত্রিয় রাজগণ একে একে আসিয়া অধিনায়কের সংখ্যা বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিনের মধ্যেই দিল্লীতে পুনর্ব্বার বিশাল সৈন্য-সাগরের আবির্ভাব হইল।

যুদ্ধ-যাত্রীর সকলেই স্ব স্ব পরিবার-বর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। মাতা, দুহিতা, স্ত্রী, সকলেই তাহাদিগকে 'রণে ভঙ্গ দেওয়া অপেক্ষা রণ-ভূমিতে দেহ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ' বলিয়া বিদায় দিল। এদিকে সংযুক্তা ভর্ত্তাকে বীর-সাজে সাজাইলেন, সাজাইতে সাজাইতে তাঁহার হৃদয় হঠাৎ অমঙ্গল আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল; হঠাৎ দক্ষিণ নেত্র স্পন্দিত হইতে লাগিল। সংযুক্তা অনিমিষলোচনে পৃথ্বীরাজের দিকে চাহিলেন, অতর্কিত ভাবে কয়েকটী মুক্তাফল কপোল বহিয়া বক্ষে পতিত হইল।

পৃথীরাজ কালবিলম্ব না করিয়া সৈন্যদল-সমভিব্যাহারে নগর হইতে বহির্গত হইলেন। সংযুক্তা ভর্ত্তার গমন-পথ নিরীক্ষণ করিতে করিতে দীর্ঘ নিঃশ্বাস-সহকারে কহিলেন, "স্বর্গ ব্যতিরিক্ত বোধ হয় আর এই যোগিনীপুরে (দিল্লীতে) দয়িতের সহিত সম্মিলন হইবে না।

সৌভাগ্য-লক্ষ্মী চির দিন এক জনের পক্ষে থাকেন না— চির দিন কাহারও সমান যায় না। অদৃষ্ট চক্রনেমির ন্যায় একবার ঊর্দ্ধ আবার অধোগামী হইয়া ইহলোকে সংসারের চাঞ্চল্য প্রদর্শন করিতেছে। পৃথ্বীরাজ তিরোরী-ক্ষেত্রে যে বিজয় পতাকায় শোভিত হইয়াছিলেন, মুসলমানদিগের চাতুরী ও কালের নিয়তিবলে দ্বিতীয় যুদ্ধে তাহা বিচ্যুত হইয়া পড়ে। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে কাগার নদীর তীরে মহম্মদ ঘোরীর সহিত এই দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়। যতক্ষণ পবিত্র ক্ষত্রিয় শোণিতের শেষ বিন্দু ধমনীতে বর্ত্তমান ছিল, ততক্ষণ হিন্দু সৈন্য শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিল। কিন্তু পরিশেষে তাহাদের দেহ-রক্ত ভারতভূমির ক্রোড়-শায়ী হইতে লাগিল। পৃথ্বীরাজ অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া শত্রু-হস্তে নিহত হইলেন। অনন্ত-প্রবাহ ক্ষত্রিয়-শোণিতে ভারতের দেহ কলঙ্কিত হইল, অনন্ত-প্রবাহ শোণিত-সাগরে ভারতের সৌভাগ্য-রবি ডুবিতে লাগিল, সংযুক্তার অমঙ্গল আশঙ্কা কলে পরিণত হইয়া গেল।

অবিলম্বে এই সাংঘাতিক সংবাদ দিল্লীতে পঁহুছিল। সংবাদ পাইবামাত্র সংযুক্তা চিতা সজ্জিত করিলেন, অবিলম্বে চিতানলের শিখা গগনস্পর্শী হইল। সংযুক্তা রত্নময় অলঙ্কার-রাশি দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক রক্তবস্ত্র-পরিহিত ও রক্ত-মাল্যে ভূষিত হইয়া এই অনলে প্রবেশ করিলেন। নিমিষ মধ্যে তাঁহার অনুপম লাবণ্য-ভূমি কমনীয় দেহ ভস্মরাশিতে

পরিণত হইল। সংযুক্তার জীবনের এই শেষ ভাগ কি ভয়ঙ্কর! কি লোমহর্ষণ!

পৃথ্বীরাজ সংযুক্তাকে ছাড়িয়া যত দিন রণভূমিতে ছিলেন, ততদিন, কেবল জল সংযুক্তার জীবন-রক্ষার অবলম্বন ছিল। চাঁদ কবির গ্রন্থের একটী স্বতন্ত্র অধ্যায়ে সংযুক্তার এই অসাধারণ পাতিব্রত্যের বিবরণ বর্ণিত আছে। সংযুক্তা পতিব্রতার দৃষ্টান্ত-ভূমি, স্বর্গস্থ দেবী-সমাজের বরণীয়া। পতিব্রতার শিরঃ-স্থানীয় সাবিত্রীর শ্রেণীতে তাঁহার নাম সমাবেশিত হইবার যোগ্য।

এক্ষণে প্রাচীন দিল্লীতে প্রবেশ করিলে সংযুক্তা-স্মৃতির অনেক চিহ্ন দৃষ্ট হয়। যে দুর্গ সংযুক্তার বিলাসভূমি ছিল, তাহার প্রাচীর অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে; যে প্রাসাদে সংযুক্তা পতি-সোহাগিনী হইয়া অবস্থান করিতেন, তাহার স্তম্ভরাজি অদ্যাপি প্রাচীন দিল্লীর ভগ্নাবশেষ সুশোভিত করিতেছে। কালের কঠোর আক্রমণে এক সময়ে এই ভগ্নাবশেষ মৃত্তিকাসাৎ হইবে, এক সময়ে এই ভগ্নাবশেষের ইষ্টকরাশি প্রাসাদান্তরের দেহ পরিপুষ্ট করিবে, কিন্তু ইহার অধিষ্ঠাত্রী সংযুক্তা কখনও এই জগৎ হইতে অন্তরিত হইবেন না। তাঁহার পতিপ্রেম, তাঁহার পাতিব্রত্য, তাঁহার মহাপ্রাণতা চিরকাল তাঁহাকে পবিত্র ইতিহাস-হৃদয়ে জাজ্বল্যমান রাখিবে।

গুরু গোবিন্দ সিংহ।

নহাপতি নামক বিবিধ ধর্ম্ম-শাস্ত্র আলোচনা করিয়া যে অভি-নব ধর্ম্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন, সে ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ পূর্ব্বে যোগীর ন্যায় নিরীহ ভাবে আপনাদের ধর্ম্ম শাস্ত্রের অনু-

যোজিত কার্য্যানুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিলেন। কাল-ক্রমে মুসলমান-দিগের অত্যাচারে এই ধর্ম্মাবলম্বিদিগের হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল, ইহারা পশুর ন্যায় বধ্য ভূমিতে নীত হইতে লাগিলেন, অসামান্য অত্যাচার—অশ্রুতপূর্ব্ব যন্ত্রণায় সকলের প্রাণ-বায়ুর অবসান হইতে লাগিল। এই নিদারুণ সময়ে শিখ-সমাজে এক মহা-পুরুষ আবির্ভূত হইলেন; তিনি স্বশ্রেণীর—স্বজাতির এই অসহ-নীয় যন্ত্রণা দেখিয়া অধ্যবসায় ও উৎসাহ-সহকারে উহার প্রতি-বিধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার তেজস্বিতা, সাহস ও মহা-প্রাণতা শিখদলে প্রবেশ করিয়া তাহাদের মধ্যে এক নূতন জীবন-শক্তির সঞ্চার করিল। এই অবধি একপ্রাণতা, স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি জাতীয় জীবনের সমুদয় লক্ষণ শিখহৃদয়ে অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, এই অবধি মহাপুরুষের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শিখগণ মহাপ্রাণ ও মহাসত্ত্ব হইয়া উঠিল। এই মহাপুরুষ ও মহামন্ত্র দাতার নাম গোবিন্দ সিংহ।

গোবিন্দ সিংহই প্রথমে শিখদিগকে সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত করেন, গোবিন্দ সিংহের প্রতিভাবলেই হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল এক ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করে। গোবিন্দ সিংহই শিখ-হৃদয়ে জাতীয় জীবনের প্রথম-পরিপোষক। শিখগণ যে তেজস্বিতা, স্থিরপ্রতিজ্ঞতা ও যুদ্ধ-কুশলতায় ইতিহাসের বরণীয় হইয়া রহিয়াছে, গোবিন্দ সিংহই তাহার মূল। তেজোবত্তা ও মহাপ্রাণতায় শিখ-গুরুদিগের মধ্যে গোবিন্দ সিংহের কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। ভারতবর্ষে শিখদিগকে এক মহাজাতিতে পরিণত করিতে নানকের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসম্প্র-দায়ের মধ্যে গোবিন্দ সিংহের ন্যায় আর কেহই যত্ন করেন নাই।

১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নানকের মৃত্যু হইলে অঙ্গদ নামে তাঁহার একজন প্রধান শিষ্য শিখদিগের গুরু হয়েন। অঙ্গদের পর

দিয়া, আনন্দ প্রকাশ করিলেন। গোবিন্দ নিজেও এই উপাধি ধারণ করিয়া গোবিন্দ সিংহ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।

গোবিন্দ সিংহ এই রূপে জাতি-গত পার্থক্য দূর করিয়া সকলকেই এক সমভূমিতে আনয়ন করিলেন, এবং সকলের হৃদয়েই নূতন জীবনীশক্তি ও নূতন তেজের সঞ্চার করিলেন। জাতি ভেদ রহিত হওয়াতে উচ্চ বর্ণের শিষ্যগণ প্রথমে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু গোবিন্দ সিংহের তেজস্বিতা ও কর্ত্তব্যকুশলতায় সে অসন্তোষ দীর্ঘকালস্থায়ী হইল না। শিষ্যগণ গুরুর অনির্ব্বচনীয় তেজোমহিমা দর্শনে আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া যথানির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা একেশ্বরবাদী হইয়া আদি গুরু নানক ও তাঁহার উত্তরাধিকারিবর্গের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল, রাজপুতদিগের ন্যায় সিংহ উপাধিতে বিশেষিত হইয়া দীর্ঘ কেশ ও দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখিতে লাগিল, এবং অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া প্রকৃত যোদ্ধার পদে সমাসীন হইল। তাহাদের পরিচ্ছদ নীলবর্ণ হইল*। "ওয়া! গুরু জি কা খালসা! ওয়া! গুরু জি কি ফতে!" (গুরু কৃত-কার্য্য হউন, জয়-শ্রী তাঁহাকে শোভিত করুক) তাহাদের সম্বোধন-বাক্য হইল। গোবিন্দ সিংহ গুরুমঠ নামে একটী শাসন-সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অমৃতসরে এই সমাজের অধিবেশন হইতে লাগিল। যাহাতে সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ হয়, যাহাতে শিখশাসন অন্তঃশত্রু ও বহিশত্রুর আক্রমণে অটল থাকে, সংক্ষেপে শিখগণ যাহাতে একপ্রাণতা, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি জাতীয় জীবনের সমুদয় লক্ষণবিশিষ্ট হয়, তাহাই গুরুমঠের লক্ষ্য হইল।

---

* গোবিন্দ সিংহের প্রতিষ্ঠিত আকালী নামক শিখ-সম্প্রদায় অদ্যাপি নীলবর্ণের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া থাকে।

গোবিন্দ সিংহ এই রূপে ধীরে ধীরে নূতন উপাদান লইয়া নূতন শিখ-সমাজ সংগঠিত করিলেন, এবং এই রূপে ধীরে ধীরে নব অভ্যুদিত শিখ-সমাজে রাজনৈতিক সাধারণতন্ত্র সংস্থাপিত করিলেন। যে শিখগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকিয়া সংযতচিত্ত যোগীর ন্যায় নিরীহভাবে কালাতিপাত করিত, তাহারাই একণে একপ্রাণ হইয়া সাধারণতন্ত্র-সমাজে সম্মিলিত হইল। গোবিন্দ সিংহ জীবনের এক সাধনায় সুসিদ্ধ হইলেন, কিন্তু ইহা অপেক্ষা উৎকট সাধনা তাঁহার সম্মুখে পতিত রহিল। তিনি পরাক্রান্ত মোগলদিগের মধ্যে সশস্ত্র খাল্‌সাদিগকে "সিংহ" উপাধিতে বিশেষিত করিয়াছিলেন, ধর্ম্মান্ধ পণ্ডিত ও পীরদিগের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানদিগকে এক সমাজে মিলিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্রাটের সৈন্য ধ্বংস করিতে পারেন নাই। গোবিন্দ সিংহ আসন্নমৃত্যু পিতার বাক্য, পিতৃ-সমীপে কৃত তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিলেন, এবং কালবিলম্ব না করিয়া পিতৃ-হন্তা অত্যাচারী যবনদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইলেন।

ভারতবর্ষের সমুদয় স্থলে মোগল শাসন বদ্ধমূল ছিল না। অন্তর্বিদ্রোহ প্রভৃতিতে মোগলসাম্রাজ্য প্রায়ই বাতিব্যস্ত থাকিত। মোগল সাম্রাজ্যের সংস্থাপয়িতা বাবর নিরুদ্বেগে রাজত্ব করিতে পারেন নাই, তৎপুত্র হুমায়ুন পাঠান বংশীয় সের সাহের পরাক্রমে রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া দেশান্তরে ষোড়শ বৎসর অতিবাহিত করেন। আকবর প্রগাঢ় রাজনীতিজ্ঞতা ও যুদ্ধকুশলতা-প্রভাবে প্রায় পঞ্চাশৎ বর্ষ ভারতবর্ষে আধিপত্য করেন, তাঁহার বিচক্ষণতায় হিন্দু ও মুসলমানদিগের জাতিবৈর অনেকাংশ তিরোহিত হয়, তথাপি তাঁহাকে স্বীয় তনয় সেলিমের কঠোর ব্যবহারে ও বঙ্গদেশের বিদ্রোহে বিব্রত হইতে হইয়াছিল। সাজিহান জীবদ্দশাতেই সিংহাসন লইয়া

তিনি পৃথিবীর পাপাচার দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেন, এবং বিধর্ম্মীর অত্যাচারে আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতেন। তিনি মনে করিতেন, মানব জাতিও সাধনাবলে মহৎ কার্য্য সাধন করিতে পারে, তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ইচ্ছার একাগ্রতা ও হৃদয়ের তেজস্বিতা সম্পাদন জন্য একণে প্রগাঢ় সাধনার সময় উপস্থিত হইয়াছে। তাহার স্মৃতি বিগত সময়ের ঋষি ও যোদ্ধৃবর্গের কার্য্যকলাপে পরিপূর্ণ থাকিত, তাঁহার কল্পনা পৃথিবীর শিক্ষাদি সুপরিষ্কৃত করিবার উপায় উদ্ভাবনে নিয়োজিত থাকিত, তাঁহার অন্তঃকরণ কুসংস্কার উন্মূলিত করিতে সচেষ্ট থাকিত। তিনি শিষ্যদিগকে মহাসত্ত্ব করিবার জন্য তাহাদের সম্মুখে ভূতপূর্ব্ব কাহিনী কীর্ত্তন করিতেন; নানক কি প্রকার কষ্ট স্বীকার করিয়া শিখগণের উপরে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন, সিদ্ধগণ কি প্রকারে আপনাদের সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন, গোরক্ষনাথ ও রামানন্দ কি প্রকারে আপনাদের মত প্রচারিত করিয়াছেন, মহম্মদ কি রূপ কষ্ট ও কি রূপ বিঘ্ন-বিপত্তি অতিক্রম পূর্ব্বক আপনাকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া লোকের মনের উপর আধিপত্য করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার বর্ণনীয় বিষয় ছিল। তিনি আপনাকে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের একজন ভৃত্য বলিয়া উল্লেখ করিতেন; তিনি কহিতেন, ঈশ্বর কোন নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট পুস্তকে আবদ্ধ নহেন, হৃদয়ের সরলতা ও মনের সাধুতাতেই তিনি বিরাজ করিতেছেন।

গোবিন্দ এইরূপে আপনার মত প্রচার করিলেন; এইরূপে তাহার শিষ্যগণ পৌরাণিক কাহিনী ও উদার উপদেশ শ্রবণ করিয়া মহাসত্ত্ব হইতে লাগিল। গোবিন্দ যত্ন পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিতেন, যত্নপূর্ব্বক বৈদিক তত্ত্ব ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপের

পর্য্যালোচনা করিতেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াও তিনি শারীরিক তেজস্বিতা লাভের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন নাই। কথিত আছে, তিনি নইনা পর্ব্বতে যাইয়া অর্জ্জুনের বীর্য্য, অর্জ্জুনের তেজস্বিতা লাভের নিমিত্ত গভীর তপস্যায় নিমগ্ন থাকিতেন। ঈদৃশ আত্মসংযম ও ঈদৃশ গভীর চিন্তায় শিখসমাজে গোবিন্দের সম্মান ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

গোবিন্দ এক্ষণে নূতন পদ্ধতিতে শিখসমাজ সংগঠিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি শিষ্যদিগকে একত্রিত করিয়া কহিলেন, "সর্ব্বান্তঃকরণে একেশ্বরের উপাসনা করিতে হইবে, কোন রূপ পার্থিব পদার্থ দ্বারা সেই সর্ব্বশক্তিমান পরমাত্মার মাহাত্ম্য বিকৃত করা হইবে না। সকলেই সরলহৃদয়ে ও একান্ত মনে ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া থাকিবে। সকলেই এক-প্রাণ হইয়া একতাসূত্রে সম্বদ্ধ হইবে। এই সমাজে জাতির নিয়ম থাকিবে না, কুলমর্য্যাদার প্রাধান্য রক্ষিত হইবে না। ইহাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, ভদ্র ইতর সকলেই সমান ভাবে পরিগৃহীত হইবে, সকলেই এক পঙক্তিতে, এক হাঁড়িতে ভোজন করিবে। ইহা তুরুকদিগকে বিনাশ করিতে তৎপর থাকিবে, এবং সকলকেই সজীব ও সতেজ হইতে শিক্ষা দিবে"। গোবিন্দ ইহা কহিয়া স্বহস্তে একজন ব্রাহ্মণ, একজন ক্ষত্রিয় ও তিন জন শূদ্রজাতীয় বিশ্বস্ত শিষ্যের গাত্রে চিনির সরবত প্রক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাদিগকে খাল্‌সা* বলিয়া সম্বোধন করিলেন; এবং যুদ্ধকার্য্য ও বীরত্বের পরিচয়সূচক 'সিংহ' উপাধি

* আরব্য ভাষা হইতে "খাল্‌সা" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার অর্থ পবিত্র, বিমুক্ত। যে ভূমির সহিত অপরের কোনও সংস্রব নাই, সচরাচর যে ভূমিকে 'খাল্‌সা' বলা যায়। গুরু গোবিন্দ হইতেই শিখদিগের সাধারণ সংজ্ঞা 'খাল্‌সা' ও উপাধি 'সিংহ' হয়।

পিতৃদত্ত তরবারি দিয়া গুরুর পদে বরণ পূর্ব্বক এই কথা বলেন যে, মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ যেন শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য না হয়, এবং এক সময়ে যেন এইমৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া হয়। গোবিন্দ পিতার এই শেষ আদেশ পালন করিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। টেগবাহাদুর পুত্রের প্রতিশ্রুতিতে প্রফুল্ল হইয়া দিল্লীতে গমন করেন। এই স্থলে ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে ঘাতকদিগের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হয়। বর্দ্ধিষ্ণু ঔরঙ্গজেব নিহত গুরুর দেহ প্রকাশ্য রাস্তায় নিক্ষেপ করেন।

যখন টেগবাহাদুরের মৃত্যু হয়, তখন গোবিন্দ সিংহের বয়স পঞ্চদশ বৎসর। পিতার শোচনীয় হত্যাকাণ্ড, স্বজাতির ও স্বদেশের অধঃপতন গোবিন্দ সিংহের মনে এরূপ গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, যবন-বিনাশ ও যবনহস্ত হইতে স্বদেশের উদ্ধারসাধনই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিল। তিনি সকলকে একভূমিতে আনয়ন করিয়া একটী মহাসম্প্রদায়ে পরিণত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু বয়সের অল্পতা ও মোগল শাসন-কর্ত্তৃগণের সাবধানতা প্রযুক্ত গোবিন্দ পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এই সঙ্কল্প অনুসারে কার্য্য করিতে সমর্থ হয়েন নাই। যাহা হউক, তিনি অনেক নীচ জাতীয় লোক দ্বারা পিতার শব আনয়ন পূর্ব্বক প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিয়া যমুনার তটবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশে গমন করেন। এই স্থানে মৃগয়া, পারস্য ভাষা অধ্যয়ন ও স্বজাতির গৌরবকাহিনী শ্রবণে তাঁহার সময় অতিবাহিত হয়।

মোগল সাম্রাজ্য ঔরঙ্গজেবের সময়েই উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয়। ঔরঙ্গজেব ছলে, বলে ও কৌশলে অনেককে দিল্লীর শাসনাধীন করেন। যে কয়েকটী পরাক্রান্ত রাজ্য পূর্ব্বে আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল, ঔরঙ্গজেবের সময়কালে

থা নানা কারণে উক্ত স্থলও ক্ষমতাশূন্য হইয়া পড়ে। এক দিকে প্রতাপ সিংহের অভাবে রাজপুত-রাজ্য ক্ষীণতেজ হয়, অপর দিকে শিবজীর বিরহে নব অভ্যুদিত মহারাষ্ট্র-রাজ্য মস্তক-শূন্য হইয়া পড়ে। ঔরঙ্গজেবের সময়ে শিবজীই কেবল স্বাধীনতার গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু অসময়ে তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তি হওয়াতে ঔরঙ্গজেবের রাজত্ব অনেকাংশে নিষ্কণ্টক ও নিরুদ্বেগ হয়। শিবজীর অভাবে ঔরঙ্গজেবের প্রতাপ প্রায় সকলেরই ভীতিস্থল হইয়া উঠে। মোগল সাম্রাজ্যের এ প্রতাপের সময় গোবিন্দ সিংহ শিখদিগের উপর নূতন রাজত্ব স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হলেন।

যমুনার পার্ব্বত্য প্রদেশে অপরিজ্ঞাত অবস্থায় গোবিন্দ প্রায় বিংশতি বর্ষ যাপন করেন। ইহার মধ্যে তাঁহার অনেক শিষ্য সংগৃহীত হয়। গোবিন্দ এক্ষণে পঞ্জাবে আগমন পূর্ব্বক এই শিষ্যদল লইয়া স্বীয় জীবনের মহদ্ব্রত সাধনে সমুদ্যত হইলেন। শিক্ষা তাঁহার অন্তঃকরণ প্রশস্ত করিয়াছিল, চিন্তাশীলতা তাঁহার বিচার-শক্তি মার্জ্জিত করিয়াছিল, এবং প্রগাঢ় কর্ত্তব্য-জ্ঞান তাঁহার স্বভাব সমুন্নত করিয়াছিল, এক্ষণে ঐক্য ও স্বার্থ-ত্যাগ তাঁহার বীজমন্ত্র হইল, তিনি সাধনায় অটল, সাহসিকতায় অবিচলিত ও মন্ত্রসিদ্ধিতে অনলস হইলেন। তিনি শিষ্যদিগের হৃদয়ে নূতন তেজ, নূতন সাহসের সঞ্চার করিলেন। তাঁহার মহামন্ত্রে শিষ্যগণ সজীব হইয়া উঠিল। গোবিন্দ এক্ষণে প্রবল-পরাক্রান্ত রাজত্বে বাস করিয়া, সেই রাজত্বই বিপর্য্যস্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, এবং বদ্ধমূল হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয়-ক্ষেত্রে উদিত হইয়া, সেই ধর্ম্মানুশাসনেরই বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন।

গোবিন্দ সাহসী, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও স্বজাতি-বৎসল ছিলেন।

অমরদাস ও রামদাস যথাক্রমে শিখ সম্প্রদায়ের অধিনায়কতা করেন। চতুর্থ গুরুর নাম অর্জ্জুনমল।* এ পর্য্যন্ত যে যে গুরু শিখদিগের অধিনায়ক হয়েন, তন্মধ্যে অর্জ্জুনেরই নানক-প্রচারিত ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশিষ্ট অধিকার ছিল। অর্জ্জুন আপনাদের ধর্ম্ম-পুস্তক আদিগ্রন্থ একত্র সংগৃহীত ও বিধিবদ্ধ করেন। এই সময়ে জাহাঙ্গীরের পুত্র খসরু বিদ্রোহী হইয়া পঞ্জাবে অবস্থান করিতেছিলেন, অর্জ্জুন তাঁহার অনুকূলে আপনাদের ধর্ম্মশাসনোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করাতে জাহাঙ্গীর তাঁহাকে দিল্লীতে আনয়ন করিয়া কারাবদ্ধ করেন। ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে কারাগারে অসহনীয় যাতনায় অথবা ঘাতকদিগের প্রাণদণ্ডে [illegible] অর্জ্জুনের মৃত্যু হয়। অর্জ্জুনের পর তৎপুত্র হরগোবিন্দ গুরু-পদে সমাসীন হয়েন। পিতার এই রূপ শোচনীয় হত্যাকাণ্ডে মুসলমানদিগের প্রতি হরগোবিন্দের মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ জন্মে। এপর্য্যন্ত শিখগণ যে নিরীহ-ভাবে কালাতিপাত করিতেছিল, অর্জ্জুনমলের মৃত্যুতে সে নিরীহ-ভাব অপগত হয়, প্রতিহিংসা বৃত্তি হরগোবিন্দকে অস্ত্র-ধারণ ও যুদ্ধকার্য্যে উত্তেজিত করিয়া তুলে। হরগোবিন্দ সর্ব্বদাই দুই খানি তরবারি ধারণ করিতেন, কেহ ইহার কারণ জিজ্ঞাসিলে তিনি অম্লান বদনে উত্তর দিতেন:— "এক খানি পিতার অপঘাত মৃত্যুর প্রতিশোধ জন্য, অন্য খানি মুসলমানদিগের শাসনের উচ্ছেদ জন্য রক্ষিত হইতেছে"। হরগোবিন্দই শিখ-সম্প্রদায়ে অস্ত্রশিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তক।

হরগোবিন্দের পাঁচ পুত্র গুরুদিত্ত, সুরজ [illegible] হাদুর, অনিরায় ও অটল রায়। ইহাঁদের মধ্যে [illegible] সর্ব্ব জ্যেষ্ঠের মৃত্যু হয়। শেষ দুই জন অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগত হয়েন, এবং অবশিষ্ট দুই জন মুসলমানদিগের অত্যাচারে পঞ্জাবের উত্তরবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

গুরুনিত্যের দাহরমল ও হর রায় নামে দুই পুত্র ছিল। ইহার মধ্যে দ্বিতীয়টী হরগোবিন্দের পদ গ্রহণ করেন। ১৬৬১ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় দুই পুত্র, রামরায় ও হরেকৃষ্ণের মধ্যে গুরুর পদ লইয়া মহাগোলযোগ আরম্ভ হয়। কোন প্রকারে এই গোল-যোগের মীমাংসা না হওয়াতে উভয়পক্ষ দিল্লীতে গমন করেন। সম্রাট ঔরঙ্গজেব শিখদিগকে আপনাদের গুরু নির্বাচন করিয়া লইতে অনুমতি দেন, এবং অনুমতিক্রমে শিখগণ হরেকৃষ্ণকে আপনাদের গুরুর পদে বরণ করে। কিন্তু দিল্লী পরিত্যাগের পূর্ব্বেই ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে বসন্ত রোগে হরেকৃষ্ণের মৃত্যু হয়; তদীয় বৃদ্ধপিতামহ টেগবাহাদুর শিখদিগের অধিনায়ক হয়েন। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে পাটনা নগরে এই টেগবাহাদুরের ঔরসে গোবিন্দ সিংহ জন্ম পরিগ্রহ করেন।

হরগোবিন্দের ন্যায় টেগবাহাদুরও কষ্টসহিষ্ণু ও পরিভ্রমণশীল ছিলেন। যখন শিখগণ তাঁহাকে গুরুর পদে বরণ করে, তখন টেগবাহাদুর নম্রভাবে কহিয়াছিলেন, তিনি হরগোবিন্দের অস্ত্র-ধারণের উপযুক্ত পাত্র নহেন। যাহা হউক, টেগবাহাদুর তদীয় প্রতিদ্বন্দ্বী রামরায়ের চক্রান্ত-জালে জড়িত হইয়া কারারুদ্ধ হয়েন। কারাগারে দুই বৎসর অতিবাহিত হয়, পরিশেষে তিনি জয়পুর-রাজ জয় সিংহের বিশেষ অনুগ্রহে মুক্তি লাভ করেন। কিয়ৎকাল আসাম, পাটনা প্রভৃতি স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক পঞ্জাবে উপনীত হয়েন। পঞ্জাবে প্রত্যাগত হইলে টেগবাহাদুর পুনর্ব্বার দিল্লীশ্বরের বিরাগ-ভাজন হইয়া উঠেন, অবিলম্বে তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হয়, টেগ বাহাদুর পরাজিত ও বন্দীভূত হইয়া দিল্লীতে আনীত হইলে ঔরঙ্গজেব তাঁহার মৃত্যু-দণ্ড ব্যবস্থা করেন।

দিল্লীতে গমনসময়ে টেগবাহাদুর স্বীয় তনয় গোবিন্দকে

তনয়দিগকে পরস্পর যুদ্ধ করিতে দেখেন, পরিশেষে ইঁহাদিগের মধ্যে অধিকতর ক্ষমতাপন্ন ঔরঙ্গজেবের ক্রূরাচারে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েন। ঔরঙ্গজেব ধর্ম্মান্ধতা কুটিলতায় ভারত-ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তাঁহার কঠোর রাজনীতিতে অনেকেই তৎপ্রতি বিরক্ত ও হতশ্রদ্ধ হইয়া উঠেন। আকবর হিন্দু ও মুসলমানদিগকে পরস্পর ভ্রাতৃভাবে মিলিত করিতে যত্ন করেন, সে যত্ন ঔরঙ্গজেবের বাধা হইতে সর্ব্বাংশে দূরীভূত হয়। ঔরঙ্গজেব নিজের সংকীর্ণতা, ধর্ম্মান্ধতা ও কঠোর ব্যবহারে অনেক শত্রু সংগ্রহ করেন। এক দিকে দুর্দ্দাম মহারাষ্ট্রীয়েরা [illegible] উত্তেজিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন, অপর দিকে শিখগণ [illegible] শাসনে উত্ত্যক্ত হইয়া স্বদেশীয়ের নিস্তেজ শরীরে তেজস্বিতার সঞ্চার করেন। এক্ষণে গোবিন্দ সিংহ পুনর্ব্বার এই তেজের উৎপত্তি করিয়া জাঠদিগের উপর নূতন রাজ্য স্থাপন করিতে উদ্যত হইলেন। তেজস্বী শিখ-গুরুর এই অভ্যুত্থান অস্বাভাবিক বা হঠকারিতাজনক বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

গোবিন্দ সিংহ এই উৎকট সাধনায় কৃতকার্য্য হইয়া শেষে আপনার শিষ্যদিগকে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া এক এক দল শিক্ষিত সৈন্য প্রস্তুত করিলেন। অপেক্ষাকৃত বিশ্বস্ত ও উন্নত শিষ্যগণের প্রতি এই সৈন্য-দলের অধ্যক্ষতা সমর্পিত হইল। এতদ্ব্যতীত গোবিন্দ সিংহ শিক্ষিত পাঠান সৈন্য আনিয়া আপনার দল পরিপুষ্ট করিলেন। শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতসমূহের পাদদেশে তিনটী দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হইল। নাহনের নিকটবর্ত্তী পাওঁটা নামক স্থানে তাঁহার একটী সেনা-নিবাস ছিল; এই সেনা-নিবাস ব্যতীত তাঁহার পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত আনন্দ-পুরমাখোয়ালে আর একটী আশ্রয়-স্থান করা হইয়াছিল। গোবিন্দ সিংহের তৃতীয় আশ্রয়-স্থান চম্পাকুমার; ইহা শতদ্রুর

রূপে অবস্থিত। পার্ব্বত্য প্রদেশে সৈন্য স্থাপন পূর্ব্বক মোগল-দিগের সহিত যুদ্ধ করা সুবিধা-জনক ভাবিয়া, গোবিন্দ সিংহ এই দুর্গ ও আশ্রয়-স্থান সমূহ সুব্যবস্থিত করিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশের সর্দ্দারদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে চেষ্টা করিলেন। এইরূপে ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দ সিংহ বিধর্ম্মী মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করেন। তিনি ধর্ম্ম-প্রচারক ও ধর্ম্মোপদেষ্টা হইয়া নানা স্থান হইতে শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এক্ষণে যুদ্ধবীর সৈন্যাধ্যক্ষের পদে সমাসীন হইয়া সেনা-নিবেশ ও নিরাপদ দুর্গ-সমূহের শৃঙ্খলা বিধানে তৎপর হইলেন।

নাহনের সর্দ্দারের সহিত গোবিন্দ সিংহের প্রথম যুদ্ধ হয়। গোবিন্দের সেনাদলে যে সমস্ত পাঠান ছিল, বেতন বাকি পড়াতে তাহারা গোবিন্দ সিংহের সম্পত্তি লুঠ করিবার জন্য শত্রুর পক্ষ অবলম্বন করে। এই যুদ্ধে গোবিন্দ সিংহের জয়লাভ হয়। শিখ-গুরুর এই প্রথম কৃতকার্য্যতা দর্শনে অনেকে আসিয়া গোবিন্দ সিংহের দল পরিপুষ্ট করে। ইহার কিছু কাল পরে মিয়া খাঁ নামক জনৈক মোগল সর্দ্দার নাদোনের রাজা ভীম চাঁদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন, নাদোন-রাজ্য শ্রীনগরের উত্তর পশ্চিম ও জম্মুর দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত। জম্মুরাজ এই যুদ্ধে মিয়া খাঁর পক্ষ অবলম্বন করাতে ভীম চাঁদ গোবিন্দ সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন; গোবিন্দ সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে ভীম চাঁদের সাহায্যার্থ সমর-স্থলে উপনীত হয়েন, এ যুদ্ধেও গোবিন্দ সিংহ ও ভীম চাঁদের সম্পূর্ণ জয়লাভ হয়। মোগল সর্দ্দার ও জম্মুরাজ পরা-জিত হইয়া শতদ্রু উত্তরণ পূর্ব্বক পশ্চাদ্ধাবিত শত্রুর হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করেন।

মিয়া খাঁর সহিত যুদ্ধের পর দিলির খাঁর পুত্র গোবিন্দ

সিংহের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন, কিন্তু শিখদিগের কৌশলে তাঁহারা কেও অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। দিলির খাঁ পুত্রের অকৃতকার্য্যতায় ক্রুদ্ধ হইয়া সমুদয় সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক হুসেন খাঁকে প্রেরণ করেন। প্রথম যুদ্ধে শিখদিগের কয়েকটী দুর্গ হুসেনের অধিকৃত হয়, কিন্তু পরিশেষে তিনি পরাজিত ও নিহত হয়েন। গোবিন্দ সিংহ যুদ্ধের সময় উপস্থিত ছিলেন না, কেবল তাঁহার অনুচরগণই বিশিষ্ট [illegible] এই যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিল।

গোবিন্দ সিংহ ও তাঁহার শিষ্যগণের এরূপ [illegible] ঔরঙ্গজেব চিন্তিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া লাহোর এবং [illegible] শাসন-কর্ত্তাকে ইহার প্রতিবিধান করিতে কঠোর [illegible] করিলেন। সম্রাটের এই কঠোর আজ্ঞায় এবার যুদ্ধের [illegible] আয়োজন হইল। ১৭০১ অব্দে দিলির খাঁ গোবিন্দের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইলেন। ঔরঙ্গজেবের পুত্র মোজাইমও ইঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইতে যাত্রা করিলেন। এই সংবাদে শিখগণের অনেকে ভীত হইয়া সন্নিহিত পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। গোবিন্দ সিংহ তাহাদিগকে কাপুরুষ বলিয়া অনেক তিরস্কার করিলেন, কিন্তু তাহারা নিবৃত্ত হইল না। অবশেষে ৪০ জন সাহসী শিখ, গুরুর জন্য আত্ম-প্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইল। গোবিন্দ সিংহ আনন্দপুরে মোগল সৈন্যকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলেন, তাঁহার মাতা ও স্ত্রী দুটী শিশু সন্তানের সহিত সরহিন্দে পলায়ন করিলেন। কিন্তু পরিশেষে ঘটনাক্রমে শিশুসন্তানদ্বয় মুসলমানদিগের হস্তে পতিত হইয়া নিদয়রূপে বিনষ্ট হইল। এদিকে গোবিন্দ সিংহ রাত্রিকালে মোগল সৈন্যগণের অগোচরে চম্পকুমারে উপস্থিত হইলেন।

শত্রুগণ চম্পকুমারও আক্রমণ করিল। এই আক্রমণে

থেকে। মহম্মদ ও মহর খাঁ মোগল সৈন্যের অধিনায়ক হয়েন। যুদ্ধ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এই সেনাপতিদ্বয় গোবিন্দ সিংহকে আত্ম-সমর্পণ করিতে অনুরোধ করিয়া একজন দূত প্রেরণ করেন, কিন্তু গোবিন্দ সিংহের পুত্র অজিত সিংহ আত্মসমর্পণের প্রস্তাবে ক্রুদ্ধ হইয়া দূতকে তিরস্কার পূর্ব্বক বিদায় দেন। দূত তিরস্কৃত হইয়া শিবিরে প্রত্যাগত হইলে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয়। অজিত সিংহ বিশিষ্ট পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। গোবিন্দ সিংহ জয়ের কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া অন্ধকার-রাত্রিতে চম্পাকুমার পরিত্যাগ করেন। প্রস্থান সময়ে দুইজন পাঠান তাঁহাকে দেখিতে পায়, এই পাঠানদ্বয় পূর্ব্বে গোবিন্দ সিংহের নিকট উপকার পাইয়াছিল বলিয়া এ সময়ে তাঁহার বিশিষ্ট সাহায্য করে। গোবিন্দ সিংহ এই রূপে চম্পা-কুমার হইতে বহোলপুর নগরে উপনীত হয়েন। এইস্থানে পীর মহম্মদ নামে একজন মুসলমানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। গোবিন্দ সিংহ পীর মহম্মদের সহিত এক সময়ে একত্রে কোরাণ পাঠ করিয়াছিলেন; পীর মহম্মদ এজন্য সহাধ্যায়ীর প্রতি বিশিষ্ট সৌজন্য প্রদর্শন করেন। গোবিন্দ পীর মহম্মদের সহিত আহার পূর্ব্বক ছদ্মবেশে ভাটিণ্ডায় উপস্থিত হয়েন। এই স্থানে শিষ্য-গণ পুনর্ব্বার যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া তাঁহার নিকট উপনীত হয়। গোবিন্দ শিষ্যদল-সহকারে অনুসরণকারী মোগলদিগকে যুদ্ধে নিরস্ত করিয়া হান্সী ও ফিরোজপুরের মধ্যবর্ত্তী দমদমায় উপ-স্থিত হয়েন। যে স্থানে গোবিন্দ সিংহ মোগলদিগকে তাড়িত করেন, সেই স্থান অদ্যাপি "মুক্তসর" নামে প্রসিদ্ধ আছে।

দমদমায় অবস্থানকালে গোবিন্দ সিংহ বিচিত্র নাটক ও এক খানি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গোবিন্দ শিখদিগের দশম গুরু। এই জন্য তৎপ্রণীত পুস্তক "দশম পাতসা কা গ্রন্থ" নামে প্রসিদ্ধ

হয়। গোবিন্দ সিংহ যে সমস্ত যুদ্ধ করেন, বিচিত্র নাটকে তৎসমুদায়ের বর্ণনা আছে, এই বর্ণনা নিতান্ত ওজস্বী ও হৃদয়োদ্দীপক। যাহা হউক, গোবিন্দ সিংহ যখন এইরূপ নির্জ্জন বাসে পুস্তক রচনা-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে আপনার নিকট উপস্থিত হইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু গোবিন্দ এই অনুরোধ প্রথমে রক্ষা করেন নাই, প্রত্যুত দর্প সহকারে কহিয়াছিলেন, তিনি সম্রাটের প্রতি কোনরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না। এক্ষণেও খালসা দল সম্রাটের পূর্ব্বপুরুষ জাহাঙ্গীরের প্রতিশোধ লইবে। ইহার পর তিনি নানকের ধর্ম্ম-সংস্কার, অর্জ্জুন ও তেগ বাহাদুরের শোচনীয় হত্যাকাণ্ড এবং নিজের অপুত্রকাবস্থা উল্লেখ করিয়া কহেন, "আমি এক্ষণে কোন রূপে পার্থিব বন্ধনে আবদ্ধ নই। স্থিরচিত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছি। সেই রাজার রাজা অদ্বিতীয় সম্রাট্ ব্যতীত কেহই আমার ভীতি-স্থল নহেন"। এই উত্তর পাইয়াও ঔরঙ্গজেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পুনর্ব্বার বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। গোবিন্দ সিংহ এবার সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত হয়েন। কিন্তু তাঁহার পঁহুছিবার পূর্ব্বেই বৃদ্ধ মোগল সম্রাটের পরলোক-প্রাপ্তি হয়।

১৭০৭ খ্রীঃ অব্দের ১ লা ফেব্রুয়ারি ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। তৎপুত্র মোজাইম 'বাহাদুর সা' নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর শাসন-দণ্ড গ্রহণ করেন। বাহাদুর সা যখন তদীয় ভ্রাতা কামবক্সের সহিত দক্ষিণাপথে যুদ্ধ-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন গোবিন্দ সিংহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আহূত হয়েন। বাহাদুর সা গোবিন্দের প্রতি বিলক্ষণ সৌজন্য দেখাইয়া তাঁহাকে সেনাপতি-পদে নিযুক্ত করেন। গোবিন্দ সিংহ এইরূপে দিল্লীর সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া আপনার শিষ্য-সম্প্রদায়ের শৃঙ্খলা বিধানে

প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে তিনি অনেক পাঠানের নিকট হইতে কতকগুলি ঘোটক ক্রয় করেন। ঘোটকের মূল্যের জন্য পাঠান এক দিন গোবিন্দ সিংহকে কঠোর ভাষায় ভৎসনা করে। গোবিন্দ এই অপমান সহিতে না পারিয়া পাঠানকে নিহত করেন। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড নিহত পাঠানের পুত্রের মনে গাঢ়রূপে অঙ্কিত থাকে। একদা সুযোগ পাইয়া এই পাঠান-তনয় গোবিন্দের শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করে। এই আঘাতেই গোবিন্দ সিংহ মানব-লীলা সম্বরণ করেন। ১৭০৮ অব্দে গোদাবরীর তীরবর্ত্তী নান্দের নামক স্থানে এই শোচনীয় কাণ্ড সংঘটিত হয়। মৃত্যুর সময়ে গোবিন্দ অষ্টচত্বারিংশ বর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন।

গোবিন্দ সিংহ শিখ-সমাজের জীবন-দাতা। তাঁহার সময় হইতেই শিখগণ মহাসম্প্রদায় বলিয়া বিখ্যাত হয়। গুরু নানক ধর্ম্ম সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু গোবিন্দ সিংহ সম্প্রদায়ের একপ্রাণতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রধান। তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ, তাঁহার সাধনা গভীর, তাঁহার শৌর্য্য অসাধারণ এবং তাঁহার মানসিক স্থিরত্ব অতুল্য। তিনি সমুদয় জাতিকে একতা সূত্রে আবদ্ধ ও একধর্ম্মাক্রান্ত করিতে প্রয়াস পাইয়া নিজের গভীর উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি জাতীয় জীবনের গৌরব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সকলে এক উদ্দেশ্যে এক সূত্রে আবদ্ধ না হইলে যে নির্জ্জীব ভারতের উদ্ধার নাই, ইহা বিলক্ষণরূপে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল, এই জন্যই তিনি হিন্দু মুসলমানকে এক ভূমিতে আনয়ন করেন, এই জন্যই তিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্রকে এক সূত্রে নিবদ্ধ করেন, এবং এই জন্যই তিনি গর্ব্ব সহকারে সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবকে লিখেন:—

"তুমি হিন্দুকে মুসলমান করিতেছ, কিন্তু আমি মুসলমানকে হিন্দু

[illegible] নগরী বিজন অরণ্যে পরিণত হইবে, যখন [illegible] দুর্গম্য রাজ-প্রাসাদ অজ্ঞাত, অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অদীনপরাক্রম বৈদেশিকের বিজয়-বৈজয়ন্তীতে পরিশোভিত হইবে, যখন প্রবলতরঙ্গাবর্ত্তময়ী বিশাল তরঙ্গিণী স্বল্প-তোয় গোষ্পদের আকার ধারণ করিবে অথবা স্বল্প-তোয় গোষ্পদ ভীষণমূর্ত্তি কল্লোলবতী নদীর আকার ধারণ পূর্ব্বক ফেণোদ্গীরণ করিয়া অকূ-[illegible] জলধি উদ্দেশে প্রধাবিত হইবে, তখনও গোবিন্দ সিংহের মহাপ্রাণতা, কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও উদারতা, অবনীতলে অক্ষুণ্ণ থা-কিবে, তখনও গোবিন্দ সিংহের পবিত্র নাম পাঞ্জাব জাতীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে।

সমাপ্ত।